আই ডি এফ পরিক্রমা

বর্ষ-২৩, সংখ্যা-২ ও বর্ষ-২৪, সংখ্যা-১, ইস্যু-৪৩ ও ৪৪, জুলাই ২০২০-জুন ২০২১

সূচিপত্র

প্রবন্ধ
লকডাউন পরবর্তীতে খেলাপী ঋণে করণীয় ২
করোনা ভাইরাস: ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের সংগ্রাম ৩-৪
করোনা মোকাবেলায়
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রম ৫-৬
স্বাস্থ্যবিধি মেনে
কিশোর-কিশোরীদের সাংস্কৃতিক
ও ক্রীড়া কর্মসূচি ৭-৮
প্রচ্ছদ কাহিনী
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ৯
স্বল্প পুঁজির শক্তি: করোনায়ও অবিচল
তানিয়ার সব্জি চাষ; মাহফুজার লেয়ার মুরগি
পালন; মরিয়মের আর্থিক সঙ্কট উত্তরণ ১০-১২
শোকবার্তা
জনাব জাফর উল্লাহ; ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল ১৩
শিক্ষা সফরে বিদেশ:
ভূস্বর্গ ভ্রমণে ১৪-১৫
হালদা প্রকল্প
হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা ১৬ - ১৯
সেমিনার/ত্রাণ বিতরণ
বাংলাদেশ-নেপাল ওয়েবিনার ২০
সোশ্যাল বিজনেস সামিট-২০২১, ভাসানচরে
রোহিঙ্গাদের ত্রাণ বিতরণ ২১
স্মৃতিকথা
আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির সূচনালগ্নে ২২ -২৩
এক নজরে কিছু কার্যক্রম ২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সদস্য : মোঃ শামীম উদ দোহা
শাম্মী মার্জিয়া
সম্পা সাহা
মৌসুমী চাকমা

" দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল "

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)
আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হোন
করোনা ভাইরাস (COVID-19) প্রতিরোধে করণীয়

আইইডিসিআর এর হটলাইন নাম্বার :
০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯২৭৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৫৫০০৬৪৪৯০১, ০১৫৫০০৬৪৪৯০২, ০১৫৫০০৬৪৪৯০৩, ০১৫৫০০৬৪৪৯০৪, ০১৫৫০০৬৪৪৯০৫. বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ নিতে ঃ ১৬২৬৩, ৩৩৩.

প্রতিরোধের উপায়
- জনসমাগম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।
- মাছ, মাংস ভালভাবে রান্না করা।
- যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা।
- অফিসের কাজ বা জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে না যাওয়া।
- জরুরী প্রয়োজনে বাহিরে গেলে নাক মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা।

কিভাবে ছড়ায় ?
- আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করলে।
- পশু, পাখির মাধ্যমে।
- ভাইরাস আছে এমন কিছু স্পর্শ করে হাত না ধুয়ে নাক, মুখ, চোখ স্পর্শ করলে।

প্রতিরোধের উপায়
- হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার বা কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে ভালো ভাবে হাত ধোয়া।
- চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা।
- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখা।
- আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা।

চট্টগ্রামের ৩টি হাসপাতালে করোনা ভাইরাস রোগীর জন্য চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে:
- ১. জেনারেল হাসপাতাল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- ২. ফৌজদারহাট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।
- ৩. রেলওয়ে হাসপাতাল, সিআরবি, চট্টগ্রাম।

আসুন নিজে সচেতন হই এবং অন্যকে সচেতন করি, সচেতনতার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ি।

প্রচারে : আইডিএফ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রবন্ধ

লকডাউন পরবর্তী খেলাপি ঋণ মোকাবেলায় করণীয়

কোভিড এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সারাবিশ্বের সকল সেক্টর। আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দিনমজুরদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক এবং যারা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষিত জনগোষ্ঠী। তাই আগামী অর্থবছরে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক সতর্কতা জরুরি। অন্যথায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। এজন্য সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা ব্যবস্থাপক ও সহকর্মীদের যেসমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ঋণ বিতরণ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করতে হবে তা হল:

১. আইডিএফ স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃক কর্মএলাকার সবাইকে কোভিড সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
২. অভাবগ্রস্থদের খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ।
৩. কর্মএলাকার সবাইকে কোভিড মোকাবেলার জন্য টিকার রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান।
৪. স্থায়ী ও সম্ভাবনাময় সদস্য জরিপ করে ঋণ বিতরণ করা।
৫. ঋণের প্রতিটি দফায় ১০০% যাচাই করে ঋণ দেয়া।
৬. পরিবারে একাধিক সদস্যদের ঋণ না দেয়া।
৭. অন্য কাহারও সুপারিশে/চাপে ঋণ না দেয়া।
৮. ব্যবসায়ে নিজস্ব বিনিয়োগ (Own Working Capital) এবং Cash Flow এর বিষয়টিকে গুরুত্বারোপপূর্বক ঋণ দেয়া।
৯. Overlapping এর ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন এবং সক্ষমতা বিশেষভাবে যাচাইপূর্বক ঋণ দেয়া।
১০. দফা বিবেচনা না করে সামর্থ্য বিবেচনায় ঋণের সিলিং নির্ধারণ করা।
১১. ভাসমান লোকদের ঋণ না দেয়া।
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ব ইতিহাস ও Track Records বিশ্লেষণ করে ঋণ দেয়া।
১৩. পরিবারের সকল সদস্যর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা।
১৪. ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ও বিকল্প আয়ের উৎস বিবেচনা করে ঋণ দেয়া।
১৫. পূর্বের ঋণ পরিশোধের ধরণ এবং যেকোন প্রকার ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ দেয়া।
১৬. এলাকার লোকদের কাছে ঋণীর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে ঋণ দেয়া।
১৭. সদস্যের পারিবারিক স্থিতিশীলতা বিবেচনায় নিয়ে ঋণ দেয়া।
১৮. প্রতিসপ্তাহে শাখাভিত্তিক বকেয়া পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা।
১৯. IGA ভিত্তিক বকেয়া শ্রেণীকরণ করে ঋণ বিতরণ প্রবাহে পরিবর্তন আনা।
২০. একাধিক বিবাহ রয়েছে, মামলা রয়েছে এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন সদস্যকে ঋণ না দেয়া।
২১. ঋণ চাহিদা নিরূপণ ও ঋণী যাচাই বিষয়ে মাঠপর্যায়ে কর্মরত স্টাফদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের ঋণ আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২২. এলাকার অন্যান্য সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় করে সদস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে পরবর্তিতে ঋণ দেওয়া।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু হতে আজ অবধি ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন, মহামারী, ঘুর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহুবার বহুভাবে। কিন্তু এ পেশার সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী বিশেষত: প্রান্তিক জনগণ অভাব ও দারিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও দুর্নিবার প্রাণশক্তি নিয়ে নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাই আমি আশাবাদী, আগামীতেও এই মহামারী করোনার প্রার্দুভাব কাটিয়ে উঠে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মুখে হাসি ফোটাবে এবং করোনা মহামারীর ক্লান্তি ও শ্রান্তি ভুলিয়ে দেবে। "অপেক্ষা শুধু সময়ের, পরীক্ষা শুধু ধৈর্যের"।

মোঃ সেলিম উদ্দীন
পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি), আইডিএফ।

আইডিএফ এর একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে তাদের বিনিয়োগ ক্ষমতাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তার আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। সেজন্যই ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে এ ঋণ কার্যক্রম বছর জুড়েই চলতে থাকে। এটি ব্যাহত হয় ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে। মানুষের শুধু আয়-রোজগারই নয়, তার জীবন যাত্রাও ব্যাহত হয় দারুণভাবে। কিন্তু শত বিপদ-আপদের মধ্যেও মানুষ তার জীবন জীবিকা চালিয়ে যেতে থাকে। সারা বছরে ক্ষুদ্র ঋণের কাজটি ব্যাহত হলেও কিভাবে তা চালিয়ে যাওয়া হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন বান্দরবন এলাকার এরিয়া ম্যানেজার তসলিম রেজভি 'করোনা ভাইরাস: ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায়ের সংগ্রাম' শীর্ষক লেখাটিতে।

করোনা ভাইরাস ঃ ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায়ের সংগ্রাম

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস একটি মারাত্মক সংক্রমণ যা ছড়িয়ে গেছে পুরো বিশ্বময়। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চের প্রথম দিক থেকে প্রচন্ড গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে। সংক্রমণ প্রতিরোধে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার লকডাউন ঘোষনার প্রস্তুতি নেয়। অনেক জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সিদ্ধান্ত এলো মার্চের পঁচিশ তারিখ থেকে পুরো দেশ লকডাউনের আওতায় থাকবে। একদম হঠাৎ করেই জনজীবনে নেমে আসে স্থবিরতা। লকডাউনে বন্ধ হয়ে যায় গণ পরিবহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের অফিস আদালত। আমরা যারা এনজিওতে কাজ করি, আমাদের কাজটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে এনজিওর হাজার হাজার সদস্য বিপদে পড়ে যায়। কেননা তারা চলমান কিস্তি পরিশোধ করে এবং কিস্তি শেষে ঋণ নিয়ে আবার কাজ শুরু করে। লকডাউনের সময় মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে শুরু করে এপ্রিল ও মে মাস পর্যন্ত পুরো সময়টা সরকারি আদেশে ক্ষুদ্র ঋণের এ সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে। অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করতে থাকে এ দেশে ঘূর্ণায়মান গ্রামীণ অর্থনীতি। এদেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ জীবিকা নির্বাহ করে এনজিওতে সংশ্লিষ্ট থেকে।

কোভিড-১৯ এমন এক মহামারী যা ভয়ানকভাবে থামিয়ে দেয় মানুষের ছুটে চলা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগ মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো ক্ষদ্র ঋণ। এখানে যে পরিমান টাকা চক্র আকারে এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরে তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সক্রিয় রাখে। তাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামীণ মানুষের জীবনে নেমে আসে কঠিন পরিস্থিতি। ফলে হিমসিম খেতে হয়েছে এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষকে। জুন মাসে লকডাউন শিথিল করা হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু হয় এবং বোঝা যায় কত কঠিন সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আমরা কাজ করছি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর উন্নয়নকর্মী হিসেবে। আমি যে এলাকায় কাজ করি তার কর্ম এলাকা হচ্ছে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির কিছু অংশ । এলাকায় সুয়ালক, বালাঘাটা, রাজবিলা, রাজস্থলী, রুমা এবং রাজারহাটে অবস্থিত ছয়টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ৬,০০০ গরীব পরিবারকে সংগঠিত করে আমাদের কাজ চলে আসছে। যাহোক, আমাদের কার্যক্রম শুরু করতে গেলে প্রথম বাঁধা আসে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। মানুষ যেহেতু আতঙ্কিত হয়ে আছে, তাই গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতে তারা আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করে। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের বুঝিয়ে আমরা সদস্যদের কাছে যাই। তাদের খোঁজখবর নিই। যারা কিস্তি পরিশোধ করতে সক্ষম এবং নিজেরা পরিশোধ করতে আগ্রহী তাদের কাছ থেকেই কেবল কিস্তি আদায় করতে চাই। কিন্তু এতেও বাঁধা আসে প্রশাসন থেকে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে ফেইসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী সংস্থাসমূহকে সকল ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বাঁধার সৃষ্টি করে। বাঁধা হয়ে দাড়ায় কেন্দ্রের ক্ষুদ্র একটি অংশ। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার লোকজন দফায় দফায় সাক্ষাৎকার নেয় এনজিও কর্মীদের। কিস্তি আদায়ের ছবি তুলে তারা বিভিন্ন নেগেটিভ নিউজ করে। তারপরেও আমরা অটল থাকি আমাদের কার্যক্রমে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বান্দরবান একেবারে আলাদা। ৩১ শে মে থেকে সারা বাংলাদেশ লকডাউন মুক্ত হলেও বান্দরবান থেকে যায় লকডাউনের আওতায়। জুনের ২০ তারিখ পর্যন্ত এখানে লকডাউন

চলমান থাকে। তারপরেও মাঠ পর্যায়ে কিস্তি আদায়ের জন্য যাওয়া অনেক কঠিন কাজ ছিল। কারণ তখনও পূনরায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সাংবাদিকরা কিস্তি আদায়ে বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন উপলব্ধি করি যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে এবং উদ্যোগ নিই তাদের সাথে সরাসরি কথা বলার। প্রথমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করি যে, আমরা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা শতভাগ মেনে গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আমরা যে সকল কাজ করছি তা হচ্ছে কোভিড-১৯ এর উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া, যারা সক্ষম এবং ঋণ দিতে ইচ্ছুক তাদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করা, যাদের ঋণ প্রয়োজন তাদের কাছে ঋণ

বিতরণ করা। এটা অবহিত করি যে, গ্রামীণ অঞ্চলের মূল চালিকা শক্তি ক্ষুদ্র ঋণ যেভাবে ঘুর্ণায়মান আকারে অর্থনীতিকে সচল রাখে তা ছড়াতে না দিলে ক্ষুদ্র পুঁজির মানুষের জন্য বিরাট সমস্যা তৈরী হবে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ বিষয়টি আমলে নেন। পরে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে জানানো হয় যে, কিস্তি আদায় করলে ঋণ বিতরণও করতে হবে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে কিছুটা নমনীয় হতে থাকে বিভিন্ন প্রতিবাদী গোষ্ঠী। আমাদের সহকর্মীদের মনোবল যথেষ্ট সক্রিয় হতে থাকে।

সবচেয়ে বেশি কাজ দেয় জুম (Zoom) মিটিং এর মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনাসমূহ। আমাদের প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালিত জুম (Zoom) মিটিং এর মাধ্যমে সুযোগ হয়, সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা এবং সমস্যা মোকাবেলায় কৌশল সমূহ শেখার। শ্রদ্ধেয় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম স্যারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে কাজ করার যথেষ্ট সাহস যুগিয়েছে। পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় ভারপ্রাপ্ত উপ- নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর নিজাম উদ্দীন স্যার এবং শ্রদ্ধেয় ডিরেক্টর (মাইক্রোফিনান্স) জনাব সেলিম উদ্দীন স্যারের সাহসী পদক্ষেপ, নির্দেশনা এবং উৎসাহে কঠিন পরিস্থিতিতেও এগিয়ে গেছে আমাদের পথচলা।

লকডাউন এর শুরু থেকে সকল সদস্যদের সাথে সহকর্মীগণ মোবাইলে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। লকডাউন শেষ হলে দ্রুত কেন্দ্র কালেকশনে যাওয়ার সুযোগ তৈরী হল। সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা সদস্যদের কাছে যাওয়া শুরু করলাম। প্রথমেই আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক বিতরণ শুরু করলাম এবং করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মানার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকলাম। এতে জনমনে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হল। যারা সঞ্চয় ও ঋণ দিতে সক্ষম তাদের কাছ থেকে জমা নিলাম এবং যাদের ঋণ প্রয়োজন তাদের কাছে ঋণ বিতরণ করলাম। ঋণ আদায়ের পাশাপাশি ঋণ বিতরণ করাতে খুব দ্রুত সচল হয়ে যায় মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম। তবে করোনার কারণে ক্ষুদ্রঋণের স্বাভাবিক কার্যক্রম যে কতটা বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে তা আমার এরিয়ার একটি হিসাব দিলে অনুধাবন করা সহজ হবে। ২০২০ সালে ১২ মাসে আমরা ১৭ কোটি টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছি, একই সময়ে আমরা ২০ কোটি টাকা বিতরণ করেছি। এ সময়ে সদস্যগণ সঞ্চয়ও জমা করেছেন প্রায় ৩.৫৮ কোটি টাকা। এই আদান প্রদানের মাস-ওয়ারী তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বছরের বিভিন্ন সময়ে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের যে হার সে তুলনায় এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে, যখন লকডাউন চলছিল এবং আমরা কাজকর্ম করতে পারিনি তখন ঋণ আদায় ও বিতরণ মারাত্মকভাবে কমে গেছে। অর্থাৎ এ সময়টিতে সদস্যগণ তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেননি। তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তাদের আয় কমে গেছে। সংস্থাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, মানুষ এ দুর্যোগেও সঞ্চয়ের প্রতি অনেকটাই মনোযোগী ছিল (তালিকা ১)।

তালিকা ১। ২০২০ সালে বান্দরবান এরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তিকে ঋণ বিতরণ, আদায় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ও শতকরা হার।

২০২০ সাল	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ঋণ বিতরণের শতকরা হার	ঋণ আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ঋণ আদায়ের শতকরা হার	সঞ্চয় জমার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয় জমাকরণের হার)
জানুয়ারি-মার্চ	৬২৮.৯	৩১.৫	৬০২.০	৩৫.২	১০৪.৩	২৯.২
এপ্রিল-জুন	৮৪.৪	৪.২	১২৮.৩	৭.৫	৫০.৯	১৪.২
জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫৫১.৬	২৭.৬	৫২৩.৪	৩০.৬	৯৪.৩	২৬.৩
অক্টোবর-ডিসেম্বর	৭৩২.৮	৩৬.৭	৪৫৮.২	২৬.৭	১০৮.৪	৩০.৩
মোট	১৯৯৭.৭	১০০.০	১৭১১.৯	১০০.০	৩৫৭.৯	১০০.০

বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হলেও এখনো পরিপূর্ণ হয়ে উঠেনি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পথচলা। কারণ করোনা ভাইরাসের প্রভাব থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারিনি। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও করোনা পরিস্থিতি খারাপ। এর উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। তবে সব শংকা কাটিয়ে আশা করছি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। আমাদের প্রাণের সংস্থা "আইডিএফ" দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে...তাই আমাদের বাইতে হবে তরী আদর্শ, সময়নিষ্ঠা ও যুক্তি দিয়ে । বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলা করে তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কার্যক্রম সচল রাখতে আমাদের সকলকে সক্রিয় থাকতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

লেখক : তসলিম রেজভী
এরিয়া ম্যানেজার, বান্দরবান।

করোনা মোকাবেলা করে

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রম

সারাবিশ্বে চলমান এই কোভিড-১৯ ক্রান্তিলগ্নেও আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ দেশের প্রান্তিক জনগণকে সেবা প্রদানে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ বিভাগ সমগ্র প্রকল্প এলাকায় সারা বছরই করোনা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নতুন জাত প্রবর্তন, বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর প্রদর্শনী, নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নত প্রযুক্তির উপকরণ সরবরাহ, মাঠ ও অন্যান্য দিবস পালন, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সভায় যোগদান ইত্যাদি। এছাড়াও নিয়মিত গ্রাম পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ দেয়া, বিশেষ করে করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেওয়াসহ নানা ধরণের কাজের মাধ্যমে সকলে ব্যস্ত থেকেছেন সারা বছরই। সকল কার্যক্রম এ স্বল্প পরিসরে বর্ণনা সম্ভব নয়, তাই এবারের সংখ্যায় অল্প কিছু কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হল। এবারের সংখ্যায় এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কিছু কার্যক্রম এর চিত্র তুলে ধরা হল।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ফ্রি ভেটেরনারী মেডিকেল ক্যাম্প

গত নভেম্বর/২০২০ ইং মাসে আইডিএফ নাটোর শাখার ১০৫/ম কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ এর উদ্যোগে "মুজিব শতবর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে ফ্রি ভেটেরনারি মেডিকেল ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এর সহযোগিতায় এসময় ৪৪ জন সদস্যর গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগলের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং গবাদি পশুগুলোর ক্ষতিকর কৃমি থেকে সুরক্ষার জন্য কৃমিনাশক ও রুচিবৃদ্ধির জন্য রুচিবর্ধক ট্যাবলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে নাটোর এরিয়ার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার, নাটোর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ শফীকুল আলম, নাটোর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও শাখার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ।

সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে আইডিএফ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, রাজশাহী যোন এর আওতায় বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর আয়োজন করা হয়। এ সময়ে নাটোর, শেরপুর, আড়ানী ও তাহেরপুর শাখার আয়োজনে ৬ টি ব্যাচে ১৫০ জন সদস্যকে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান, ভিএফএ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নলডাঙ্গা, নাটোর। এছাড়াও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিভাগ, রাজশাহী যোন এর উদ্যোগে নাটোর, তাহেরপুর ও শেরপুর শাখায় সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ (লালশাক, সবুজশাক, কলমিশাক, ধনিয়াপাতা, শীম, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, করলা) ও ফলের চারা (পেঁপে) বিতরণ করা হয়েছে। সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাপূরণ এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বসতবাড়ির আশেপাশে, মাচায়, চালে শাক-সবজি এবং ফল উৎপাদন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখিত শাখাসমূহের ৪৯ টি কেন্দ্রে ১,৩২৩ জন সদস্যর মাঝে ১,৮১০ গ্রাম বীজ এবং ৮৭ জন সদস্যর মাঝে ৮৭ টি ফলের (পেঁপে) চারা বিতরণ করা হয়। এসময় সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও প্যারাভেট সদস্যদের শাকসবজি ও ফল উৎপাদনের বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পেকিন হাঁস পালনে নতুন আয়ের সম্ভাবনা

পেকিন একটি গৃহপালিত হাঁসের জাত; যা দেখতে খুব সুন্দর এবং খেতে খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। মূলতঃ ডিম এবং মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। এদের বাহিরের পালক সাদা ও মাঝে মাঝে হলুদ হয়ে থাকে। এই হাঁসটি সাধারণত বাড়ী বা খামারের ভিতরে পালন করা হয়ে থাকে এবং সূর্যের আলোতে যেতে দেওয়া হয়না। পেকিন হাঁসের চোখ দূর থেকে দেখলে কালো মনে হয় কিন্তু কাছে থেকে ধূসর-নীল দেখায়। এদের ঠোঁট এবং পা কমলা বর্ণের। প্রাপ্তবয়স্ক পেকিন হাঁসের ওজন প্রায় ৩.৬-৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা খুব দ্রুত বাড়ে। এদের গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৯-১২ বছর। বাণিজ্যিকভাবে মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্বব্যাপী এ জাতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমাদের দেশেও পেকিন হাসের চাহিদা তৈরী হয়েছে। পেকিন হাঁস পালনে ইতোমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছেন এমচরহাট শাখার লাকড়ী পাড়ার শিপ্রা দাশ; তার পেকিন হাঁস চাষের সাফল্যের মুল কৃতজ্ঞতা জানান- আইডিএফ এবং পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে যাদের সার্বিক সহযোগিতায় পেকিন হাঁস চাষের সাথে পরিচিত হয়েছেন।

কৃষি ক্যালেন্ডার: বছরব্যাপী সবজির চাষাবাদ

ষড় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। প্রকৃতিতে বারো মাসে ছয় ঋতু বা মৌসুম হলেও কৃষি মৌসুম তিনটি-যথা: খরিপ-১, খরিফ-২ ও রবি। ফসল আবাদ ও উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে কৃষি মৌসুমকে এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে প্রতি মাসের প্রতিদিন কিছু না কিছু কৃষি কাজ করতে হয়। কৃষিকাজে মূলত সারা বছরই কম বেশি ব্যস্ততা থাকে। বিশেষ করে চার ফসলী জমি নিয়ে বছরের ৩৬৫ দিনই কৃষককে ব্যস্ত থাকতে হয়। সে জন্য বলা যায় বছরের প্রতিটি দিনই কৃষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃষি পঞ্জিকায় থাকে না ছুটির দিন। প্রচলিত কিছু ফসল নিয়ে ৩৬৫ দিনের একটি পঞ্জিকা সাজানো হয়েছে। কৃষকদের কোনো কাজে আসলে বা উপকার হলেই আইডিএফ এর এই প্রচেষ্টা সফল হবে। প্রত্যাশা একটাই - "কৃষকরা লাভবান হলে সমৃদ্ধ হবে কৃষি ভুবন"।

ব্ল্যাক বেরী জাতের তরমুজ চাষে সাফল্য

নির্দিষ্ট মৌসুম ছাড়াও সারা বছরই মাচা পদ্ধতিতে নতুন জাতের "ব্ল্যাক বেরী" তরমুজের চাষ করা যায়। তরমুজের সাধারণ মৌসুম শেষ হওয়ার পর মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাটির ঢিবি তৈরি করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়ে এবং মাচা তৈরি করে এ তরমুজের চাষ করা যায়। মাত্র ৫৫-৬০ দিনেই এক একটি তরমুজ প্রায় আড়াই থেকে তিন কেজি ওজনের হয়। তবে গ্রীষ্মকালে ফলন ভালো হয়। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার পুটিবিলা এমচর হাটের পাশেই মাঝিপাড়া ও নাথ পাড়ায় মাচায় "ব্ল্যাক বেরী" জাতের তরমুজ চাষে সাফল্য পেয়েছেন মনোয়ারা বেগম ও লাকী নাথ। তারা বলেন যে, এই অঞ্চলে এই জাতের তরমুজ চাষ হয় না বললেই চলে এবং শুরুতে আমরাও পরিচিত ছিলাম না। এ জাতের তরমুজ চাষে কম খরচে অনেক লাভ করা যায়। বাজারে আনা মাত্রই শেষ হয়ে যায় এবং বাজারমুল্য অনেক ভালো। সর্বশেষে সাফল্যের মুল কৃতজ্ঞতা জানান- আইডিএফ এবং পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে যাদের সার্বিক সহযোগিতায় এই চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচিত হয়েছেন। তাদের এই চাষাবাদের সাফল্য দেখে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক উক্ত ফসল চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারাও অবদান রাখতে চান কৃষি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিশোর-কিশোরীদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন ও বিকাশের জন্য আইডিএফ ২০১৯ সাল থেকে পিকেএসএফ এর সহায়তায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এলাকার ৫২ টি ক্লাব ও ২৩ টি ফোরাম এর ৮০৪ জন কিশোর এবং ১৪০৩ জন কিশোরী মোট ২২০৬ জনকে নিয়ে ২০২০ সালে কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা বছরই কিছু না কিছু কার্যক্রম চলমান ছিল। ২০২০ সালে পরিচালিত এ ধরনের কিছু কর্মকান্ডের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হল।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় ২৭৩ টি ক্লাবের ৮৫১ জন কিশোর ও ১৭১৮ জন কিশোরীসহ সর্বমোট ২৫৬৯ জন অংশগ্রহণকারী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে যা মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ক্লাবওয়ারী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আন্তঃ ক্লাস্টার চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, রচনা/প্রবন্ধ, উপস্থিত বক্তৃতা, যেমন খুশি তেমন সাজো), সহমর্মিতা কর্ণার ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (দৌড়, দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই, পিল পাসিং, বল নিক্ষেপ, মার্বেল চামচ, সুঁই সুতা)।

বিজয় দিবস উদযাপন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এই ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পরে। সঠিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য তাদের মধ্যে দেশপ্রেম বজায় রাখার জন্য দিন গুলো মনে রাখা, শহীদদের প্রতি স্মরণ করিয়ে দেয়া খুবই প্রয়োজন। তারই প্রেক্ষিতে ৩৫৩ জন কিশোর কিশোরীদের নিয়ে অতীব উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে রাঙ্গামাটির ২ টি, বোয়ালখালীর ৩ টি, বান্দরবানের ১৩ টি ও সাতকানিয়ার ১ টি ক্লাবে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। প্রতিটি ক্লাস্টারে পৃথক পৃথক ভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা

জীবনে সুস্থ্য ভাবে বেচে থাকার জন্য শিশুকাল থেকেই যত্নের প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় এই র্কমশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া ক্লাস্টারের ২৪ টি ক্লাবের ৫১৮ জন কিশোর-কিশোরী ও ১৩৫ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বলতে কি বোঝায়, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার গুরত্ব, সে সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা, নিয়মিত প্যাড ব্যবহার, কাপড় ব্যবহারের ঝুঁকি, জরায়ু ক্যান্সার কেন হয়, বাল্য বিবাহ, অল্প বয়সে (১৮ বছরের নিচে) মাতৃকালীন ঝুঁকি, ব্লাড গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা - ডায়রিয়া, হাত পা কাটা, জ্বর, খিঁচুনী, মাথাব্যথা, অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কামড়, গলায় কাটা ইত্যাদি বিষয়ে কি কি করণীয় সেসম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

স্বল্প মূল্যে প্যাড বিতরণ, বিনা মূল্যে ব্লাড গ্রপ, উচ্চতা ও ব্লাড প্রেসার নির্ণয়

আইডিএফ মেয়েদের ঋতুবর্তীকালীন সময়কে সুরক্ষিত করতে পিছিয়ে পড়া সমাজের কিশোরীদের স্বল্প মূল্যে প্যাড বিতরণের উদ্যোগ নেয়। সকল ক্লাবে স্বল্প মূল্যে ১২৪৯ টি প্যাড বিতরণের পাশাপাশি ২২৭২ জন সদস্য ও তাদের অভিভাবকদের ব্লাড গ্রুপিং, উচ্চতা ও ব্লাড প্রেসার নির্ণয় করা হয়। এছাড়া ২২০ জনের ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয়।

নেতৃত্ব বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়ন

কিশোর কিশোরীদের কাজের দক্ষতা ও নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে এই কর্মসূচি। তাদের দক্ষতা বাড়াতে ও নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেয় আইডিএফ। যেমন এ কর্মসূচির আওতায় "আমার প্রতিভায় আমি সেরা" নামে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা নিজেরা যেসব হস্তশিল্পে পারদর্শী সে কাজগুলোর মাধ্যমে কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে তাদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড

কিশোর কিশোরীদের সুস্থ মননের বিকাশের লক্ষ্যে কৈশোর কর্মসূচি প্রতিটি প্রতিটি ক্লাস্টারের সকল ক্লাবে নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ১৭৯৮ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। আর বিভিন্ন ক্রীড়া কার্যক্রমে সর্বমোট ১৪৮১ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

প্রচ্ছদ কাহিনী

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় মার্চ ২০২০ সালে এবং ক্রমান্বয়ে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। প্রথম দিকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এবং ভয়ের সৃষ্টি হয়। সরকার লকডাউন ঘোষণা করে এবং প্রায় সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাস যেহেতু একটি ভাইরাস জাতীয় নতুন রোগ এবং এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই, সেহেতু মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং সাবধানতা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকার। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইডিএফও এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। "করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে দিন" শিরোনামে লিফলেট তৈরী করে আইডিএফ এর সকল কর্মএলাকা এবং সদস্যদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। এ নিয়ে আমাদের গত সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরী করা হয়েছিল। কোভিড পরিস্থিতি চলমান থাকায় আইডিএফ এর বিভিন্ন কর্মসূচির জন্যও বিভিন্ন সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরী করে সকল মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস নেওয়া হয়। আইডিএফ এর 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া' কর্মসূচি কর্তৃক প্রণীত এবং বিতরণকৃত লিফলেটটি দিয়ে এবারকার সংখ্যার প্রচ্ছদটি সাজানো হল।

আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হোন

করোনা ভাইরাস (Covid-19) প্রতিরোধে করণীয়

করোনা কিভাবে ছড়ায়?

- আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করলে।
- পশু, পাখির মাধ্যমে।
- ভাইরাস আছে এমন কিছু স্পর্শ করে হাত না ধুয়ে নাক, মুখ, চোখ স্পর্শ করলে।

প্রতিরোধের উপায়ঃ

- জনসমাগম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।
- মাছ, মাংস ভালভাবে রান্না করা
- যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা।
- অফিসের কাজ বা জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে না যাওয়া।
- জরুরী প্রয়োজনে বাহিরে গেলে নাক মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা।
- হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার বা কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা।
- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখা।
- আক্রান্ত ব্যাক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা।

আইইডিসিআর এর হটলাইন নাম্বারসমূহঃ

০১৯৩৭১১০০১১,০১৯৩৭০০০০১১,০০১৯২৭৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৫৫০০৬৪৯০১, ০১৫৫০০৬৪৯০২, ০১৫৫০০৬৪৯০৩, ০১৫৫০০৬৪৯০৪, ০১৫৫০০৬৪৯০৫.

চট্টগ্রামের ৩ টি হাসপাতালে করোনা ভাইরাস রোগীর জন্য চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। যথাঃ

১. জেনারেল হাসপাতাল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
২. ফৌজদারহাট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।
৩. রেলওয়ে হাসপাতাল, সিআরবি, চট্টগ্রাম।

স্বল্প পুঁজির শক্তি: করোনায়ও অবিচল

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। চলমান বছরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়ে। সংকটের মুখে পড়ে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর, সাথে বিপর্যয়ে পড়ে অনেক সদস্য। কিন্তু এই মহামারীর সময়েও সচেতনভাবে নিরলস নিজের কাজ করে সাফল্যের মুখও দেখেছেন আইডিএফ এর অনেক সদস্য, বিশেষ করে, কৃষিতে নিযুক্ত কৃষকগণ। যারা ফসল ফলিয়েছেন, পশুসম্পদ লালনপালন করেছেন, মাছের চাষ করেছেন, করোনার থাবা থেকে তারা অনেকটাই মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছেন। এমনই তিনজন সদস্যের করোনাকালীন সময়ে সফল উদ্যোগের কথা লিখে পাঠিয়েছেন মঙ্গল বাশি চাকমা।

তানিয়ার বসতবাড়ীতে সবজি চাষ, করোনকালীন সময়ে আশীর্বাদ

গুচ্ছগ্রাম আইডিএফ সরকারহাট শাখা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে পাহাড় বেষ্টিত একটি গ্রাম। এই গ্রামের তানিয়া আক্তার আইডিএফ এর ৮০/ম কেন্দ্রের একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ছিলেন গৃহিণী। স্বামী প্রবাসী। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তানিয়ার সংসার। গৃহিণী তানিয়া কর্মদ্যোমী ছিলেন। আইডিএফ এর নিয়মিত সদস্য হিসেবে তার যথেষ্ট সুনামও ছিল। তার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সারা বছর সবজি চাষ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গাও ছিল। ফলে 'বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ প্রকল্পের উপকারভোগী' হিসেবে তাকে নির্বাচন করা হয়।

অন্যান্য নির্বাচিত উপকারভোগীদের সাথে তানিয়াকেও সবজি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংস্থা থেকে ৩ মৌসুমের জন্য বিভিন্ন ধরণের সবজির বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। মাচা তৈরি করা এবং মাচার নিচে ছায়াযুক্ত পরিবেশে আদা, আলুচাষ করা, বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় পেঁপে, লেবুর চারা রোপন নিশ্চিত করা হয়। সারা বছরব্যাপী কৃষি কর্মীর মাধ্যমে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে তানিয়ার বাগানে ঢেড়স, পুঁইশাক, ডাটাশাক, লালশাক, বেগুন, শিম, চালকুমড়া ও করলা জাতীয় সবজি রয়েছে যা পরিবারের চাহিদা মেটানোর পরে গ্রামবাসীর কাছে বিক্রি করেন। শুধু করোনাকালীন সময়ে তানিয়া প্রায় ১৫০০ টাকার সবজি আশেপাশের গ্রামবাসীদের নিকট বিক্রি করেছেন।

করোনাকালীন সময়ে তানিয়ার এই সবজি বাগানের ভূমিকা: তানিয়ার স্বামী দীর্ঘদিন বিদেশে থাকেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য পরিবারে তেমন কেউ নেই। তাদের গ্রাম থেকে বাজার বেশ দূরে হওয়াতে তানিয়ার জন্য নিয়মিত বাজার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আইডিএফের কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া বছরব্যাপী সবজি চাষ তার দৈনন্দিন সবজি চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। করোনাকালীন সময়ে যখন সারাদেশে লকডাউন ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল সেই সময়টাতে বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি বাগান তানিয়ার কাছে আশীর্বাদ রূপে ধরা দেয়। তাছাড়াও সবজি চাষের জন্য আইডিএফ থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন সেই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা সারা জীবন তার কাজে লাগবে বলে জানান।

তানিয়ার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের সবজি প্রতিবেশীরা ক্রয় করেছেন এবং তানিয়ার সবজি বিক্রির আয় দেখে তারাও উৎসাহিত হয়েছেন। প্রতিবেশীগণ নিজেদের বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষের ব্যাপারে তানিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও নিয়ে থাকেন। সবজি চাষে সফল তানিয়া তাদের অনুপ্রেরণা এবং তানিয়ার অনুপ্রেরণা আইডিএফ। নিজের এই সাফল্যের জন্য আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তানিয়া।

লেয়ার মুরগি পালন করে করোনাকালীন আর্থিক সংকট মোকাবেলা করছেন মাহফুজা বেগম

ভয়াবহ করোনার (কোভিড-১৯) থাবা পুরো বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এই মহামারী থেকে বাংলাদেশও রেহাই পায়নি। গত ৮ মার্চ, ২০২০ ইং প্রথম করোনা রোগী সনাক্তের পর থেকেই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তখন থেকেই জীবন-জীবিকা হয়ে ওঠে কঠিন। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হয় প্রায় সকল পেশার মানুষই। এই কঠিন সময়ে মাহফুজা বেগমের লেয়ার মুরগির খামার তার আশার আলো হয়ে দেখা দেয়, যার মাধ্যমে করোনাকালীন দুঃসময়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার চ্যালেঞ্জ তিনি মোকাবেলা করতে পেরেছেন।

মাহফুজা বেগম বাঁশখালী উপজেলার চন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী মোহাম্মদ নুরুল আলম ভাড়ায় রিকশা চালাতেন। অভাব অনটনের সংসারে একে একে পাঁচ সন্তানের জন্ম হলে খরচ বেড়ে যায় বহুগুণ। শুধুমাত্র রিকশাচালক স্বামীর আয় দিয়ে সংসারের খরচ কোনভাবেই সংকুলান হচ্ছিলনা। তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে বিকল্প চিন্তা করতে বাধ্য হন। আর বিকল্প চিন্তা করতে গিয়ে প্রথমেই মুখোমুখি হলেন পুঁজি সংকটের। তখন মাহফুজা এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন তাদের গ্রামে আইডিএফ নামক একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা কাজ করছে। যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে সৃজনশীল কাজের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। তখন তিনি আইডিএফ বাঁশখালী শাখার ৭৯/ম চন্দ্রপুর কেন্দ্রে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন।

মাহফুজার এগিয়ে চলার শুরু এখান থেকেই। যেহেতু মাহফুজার স্বামী ভাড়ায় রিকশা চালাতেন তাই প্রথম দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর জন্য একটি রিকশা কেনেন। নিজেদের রিকশা চালানোর আয় দিয়ে নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে কোন সমস্যা হয়নি তার। প্রথম দফার ঋণের কিস্তি যখন শেষের দিকে তখন মাহফুজা, স্বামীকে সাথে নিয়ে আরো কোন কাজ করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। তাদের বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত জায়গা থাকায় লেয়ার মুরগীর খামার করার সিদ্বান্ত নিলেন তারা। এই পরিকল্পনার বিষয়টি তিনি আইডিএফ কর্মকর্তাকে জানান। এর মধ্যে মাহফুজা শাখায় আইডিএফ এর একজন বিশ্বস্ত ও নিয়মিত সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম দফার লোনের টাকা পরিশোধ করে দ্বিতীয় দফায় লোনের জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে আইডিএফ প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর আওতায় তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ ও আর্থিক অনুদানও পান তিনি।

দ্বিতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর পাশে নিজস্ব জায়গায় ২০০ টি লেয়ার মুরগি নিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ৬০০ টি লেয়ার মুরগি রয়েছে। আইডিএফ থেকে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন ও জীবাণুনাশক ঔষধ সরবরাহ করার ফলে মুরগির বাচ্চার মৃত্যুহার ও রোগবালাই অনেক কম। উপযুক্ত পরিচর্যা ও সঠিক আলো দেওয়ার কারণে ২০ সপ্তাহ পর থেকে দৈনিক ৯০% করে ডিম পাচ্ছেন। লেয়ার মুরগির খামার থেকে খরচ বাদে তার মাসিক আয় প্রায় ৮০০০/- টাকা। বর্তমানে স্বামী-সন্তান ও সংসার নিয়ে সুখে আছেন মাহফুজা বেগম।

করোনাকালীন সময়ে যেহেতু বাড়ীর বাইরে বের হওয়া অনিরাপদ এবং ঝুকিপূর্ণ, তাই তার স্বামী সেই সময়ে রিকশা চালানো বন্ধ রেখেছিলেন। এই কঠিন সময়ে তার লেয়ার মুরগীর খামার থেকে যে আয় হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে তা দিয়ে পুরো পরিবারের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হয়েছেন মাহফুজা বেগম। তার একাগ্রতা ও পরিশ্রম করার মানসিকতা সেই সাথে আইডিএফ এর প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমেই করোনাকালীন ভয়াবহ আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। তার এই লেয়ার মুরগির খামার দেখে স্থানীয় অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন এবং লেয়ার মুরগি পালনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শও নিয়ে থাকেন তার কাছ থেকে। এর সকল কৃতিত্ব আইডিএফ এর এ কথা জানান মাহফুজা বেগম। এই সফলতার জন্য তিনি আইডিএফ এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

করোনাকালীন আর্থিক সঙ্কট উত্তরণে সফল মরিয়ম বেগম

সদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ হচ্ছেন রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের ডাবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা মরিয়ম বেগম। স্বামী পেশায় কৃষক। স্বামী, শ্বাশুড়ী, দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবার তার। কৃষক স্বামীর আয়ে চলা সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। তাই বিকল্প কিছু করার চিন্তা করতেন মরিয়ম বেগম। কিন্তু প্রথমেই যে জিনিসটা প্রয়োজন তা হচ্ছে মূলধন বা পুঁজি, যা ছিল না তার। তবে বাড়ীর চারপাশে কিছু জায়গা ছিল যেখানে দেশী মুরগি পালনের চিন্তা করলেন তিনি। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে কাজটা শুরু করতে পারছিলেন না। এমনই সময়ে এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক সংস্থা আইডিএফ সম্পর্কে জানলেন মরিয়ম। সেই প্রতিবেশীর সাথে আইডিএফ বেতবুনিয়া শাখায় গিয়ে বিস্তারিত জানলেন। ২৮ নভেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে তিনি সদস্য ভর্তি হলেন। এরপর মরিয়ম তার পরিকল্পনার কথা আইডিএফ এর কৃষি কর্মকর্তার সাথে অলোচনা করেন এবং স্বল্প পুঁজিতে কিভাবে দেশী মুরগি পালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় সেই ব্যাপারে জানতে চান। তার প্রবল আগ্রহ দেখে সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করলেন যেন দেশী মুরগি পালনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় আগে থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

এরপর আইডিএফ থেকে প্রথম দফায় ২০ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে দেশী মুরগী পালনের প্রকল্প শুরু করেন মরিয়ম বেগম। তার যত্ন, ধৈর্য্য এবং আইডিএফ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ফলে এক বছরের মধ্যেই লাভের মুখ দেখতে থাকেন। ফলে তার অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। তিনি আরো বড় পরিসরে কাজ শুরু করতে চাইলেন। আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতেন তিনি। তার সাফল্য, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস দেখে কৃষি কর্মকর্তা তাকে লেয়ার মুরগি পালনের পরামর্শ দিলেন। সেই মোতাবেক কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার লেয়ার মুরগির ফার্মে ৯৫ টি মুরগি আছে যা থেকে প্রতিদিন গড়ে ৯০ টি ডিম পেয়ে থাকেন। মাস শেষে খরচ বাদে লাভ থাকে ১০ হাজার টাকা। আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সংস্থা হতে ঋণের পরিমাণও বাড়াতে থাকেন মরয়িম বেগম। বর্তমানে ১,৫০,০০০ টাকার ঋণ চলমান। এছাড়াও গরু, ছাগল, হাঁস ও কবুতর পালন করছেন তিনি। বর্তমানে স্বচ্ছল পরিবার তার। স্বচ্ছন্দে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে পারছেন।

মহামারী করোনার সময়ে অনেকেই দুর্যোগের মুখে পড়েন। কিন্তু মরিয়ম বেগমের পরিশ্রম ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা তাকে অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মরিয়ম বেগম বলেন “আমার জীবন যুদ্ধের সময় করোনার ভয়ানক থাবা ছিলনা কিন্তু দারিদ্র্যের থাবা ছিল। সেই দারিদ্র্যকে আমি জয় করেছি আর এই মহামারী করোনার দুর্যোগপূর্ণ আর্থিক সংকটও মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি আইডিএফ এর সহযোগিতায়।এজন্য আইডিএফ এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।”

শেষ কথা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে করোনাকালীন সময়ে আইডিএফ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত সকল সদস্যার খোঁজখবর রেখেছে। প্রয়োজনানুসারে ঋণ বিতরণও করা হয়েছে। এসময়ে সদস্যদের প্রকল্পের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশব্যাপি ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও আইডিএফ এর অনেক সদস্য করোনাকালীন দুঃসময়কে সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে। সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, আইডিএফ এর পুঁজির সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনাতে অনেক দরিদ্র সদস্য অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়েছেন, করোনাকালের বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেমিনার/ত্রাণ

মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে কোভিড ১৯ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার

বিগত ক'য়েক বছর যাবত বাংলাদেশের আইডিএফ এবং নেপাল এর কয়েকটি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর উভয় দেশের মধ্যে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির জন্য তা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে আছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দুই দেশেই ক্ষুদ্রঋণ খাতের পরিচালনায় বেশ কিছু পরিবর্তন এবং নতুন নীতিমালা প্রনয়ণ করে এ সঙ্কট উত্তরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর আলোকে মাঠ পর্যায়ে অনুশীলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে বিগত ৪ জুন ২০২১ তারিখে 'Managing Covid-19 Crisis - Changes in Microfinance' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এবং নেপালের National Banking Institute Ltd (NBI) ও Nepal Microfinance Banker's Association (NMBA) যৌথভাবে এর আয়োজন করে। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন আইডিএফ এর উপদেষ্টা ড. মোসলেহ উদ্দিন সাদেক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন NBI এর সিইও জনাব কুমার লামসাল এবং প্রধান বক্তা (Key Note speaker) ছিলেন Nepal Rastra Bank এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সুমন কুমার অধিকারী।

ওয়েবিনারে বাংলাদেশের পক্ষে 'কান্ট্রি পেপার' উপস্থাপন করেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, যেখানে তিনি বাংলাদেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে কোভিড–১৯ এর কারণে সৃষ্ট মহামারীর প্রভাব এবং এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক), পিকেএসএফ ও এমআরএ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়াও করোনা মহামারীর সময়কালে বাংলাদেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের উপর গবেষণালব্ধ তথ্য তিনি উপস্থাপন করেন। এরপর নেপালের পক্ষে 'কান্ট্রি পেপার' উপস্থাপন করেন Bijaya Laghubitta Bittiya Sanstha (VLBS) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব বসন্ত রাজ লামসাল, প্রেসিডেন্ট, NMBA. তিনি এসময় সংক্ষেপে নেপালের মাইক্রোফ্যাইন্যান্সের চিত্র তুলে ধরেন এবং বিগত অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর এ করোনা পরিস্থিতির কারণে উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় তাদের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি করোনা মহামারীকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়াও ২০২০ সালের জুলাই মাস এবং ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে নেপালে সংঘটিত গবেষণার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন।

এছাড়াও ওয়েবিনারে দুই দেশের আরও ৬ জন অভিজ্ঞ আলোচক তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুল আওয়াল, নির্বাহী পরিচালক, ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ); জনাব মোঃ ইমরানুল হক চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টা, অন্তর মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন; জনাব মনোয়ার রেজা খান, নির্বাহী পরিচালক, মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)। অন্যদিকে নেপালের পক্ষে বক্তব্য রাখেন Mr. Numa Nath Poudel, CEO, First Microfinance Laghubitta; Dr. Madan Ghimire, CEO, Samata Gharelu Laghubitta; এবং Mr. Prakash Raj Sharma, CEO, Laxmi Laghubitta.

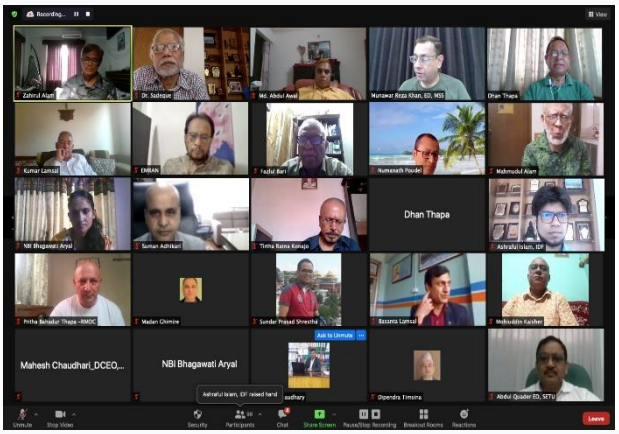

উপস্থাপনা শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলোচনা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এতে দুই দেশের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায় বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন। পরিশেষে ওয়েবিনারে সমাপনী বক্তব্য রাখেন Mr. Dhan Thapa, Head of Programs, NBI, Nepal. তিনি এসময় ওয়েবিনারের আলোচক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ওয়েবিনারের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আইডিএফ এর সাথে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ রক্ষার্থে ভবিষ্যতে আরও এ ধরণের ওয়েবিনার আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ও নেপালের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের ১৫০ জনের অধিক প্রতিনিধি এ ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরবর্তীতে NBI ও আইডিএফ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

গ্লোবাল সোশ্যাল বিজনেস সামিট - ২০২১

সোশ্যাল বিজনেস হচ্ছে এমন এক ধরণের ব্যবসা বা উদ্যোগ যা সমাজের সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতি। এটি চিরায়ত লাভজনক ব্যবসা থেকে ভিন্নতর। বর্তমান বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণাঙ্গতার কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় উদ্যোক্তা না হয়ে চাকরির পেছনে ছুটছে। কিন্তু বাণিজ্য শিক্ষাকে এভাবে সংস্কার করতে হবে যেন একজন শিক্ষার্থী উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারে এবং তার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণাকে সামনে রেখে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের উদ্যোগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোশ্যাল বিজনেস ডে পালন করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় "No Going Back" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিগত ২৮ জুন তারিখে শুরু হয় ১১ তম সোশাল বিজনেস ডে। তবে করোনা মহামারীর কারণে এবার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেছেন। জুন ২৮ থেকে ২ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। নোবেল বিজয়ী ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস সম্মেলনে সামাজিক ব্যবসাসহ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী এ আয়োজনে ১৬ টি Plenary সেশন ছিল। তন্মধ্যে আয়োজনের দ্বিতীয় দিনে ৬ নং Plenary সেশন এ আইডিএফ এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম একজন প্যানেলিস্ট হিসেবে "Building the Rural Economy as an Independent Economy" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো, বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি স্বতন্ত্র (Independent) গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ, গ্রামীণ উন্নয়নে এর প্রয়োজনীয়তা এবং স্বতন্ত্র গ্রামীণ অর্থনীতি বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ তার মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও আয়োজনের চতুর্থ দিনে একাডেমিয়া ফোরামে আইডিএফ এর মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মাহমুদুল হাসান আইডিএফ-পিকেএসএফ এর হালদা প্রকল্পে স্থাপিত হালদা হ্যাচারি কিভাবে একটি সামাজিক ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে তা একটি ভিডিও ডকুমেন্টারিসহ উপস্থাপন করে এর গুরুত্ব, অগ্রগতি ও সাফল্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

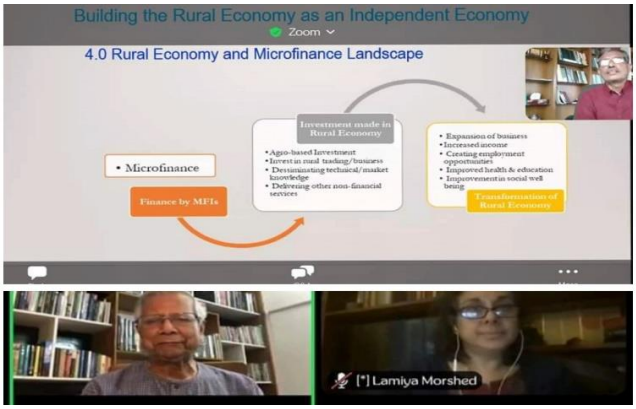

ত্রাণ বিতরণ : ভাসানচরে আর্ত মানবতার পাশে আইডিএফ

আইডিএফ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ১৯৯২ সাল থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ, মহামারী বা যে কোন মানবিক বিপর্যয়ে আইডিএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বিগত ২০১৭ সাল থেকে বালুখালি ১৮ নং ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধ বিতরণ, পয়ঃনিষ্কাশন, গভীর নলকূপ স্থাপন, সোলার মিনিগ্রীড থেকে ঘরে ও রাস্তায় লাইট বিতরণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে আসছে। ডিসেম্বর'২০২০ হতে বাংলাদেশ সরকার নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তর শুরু করলে জানুয়ারী'২০২১ মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আয়োজিত সকল এনজিও নির্বাহী প্রধান/প্রতিনিধিদের নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত এক জরুরী সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাননীয় মহাপরিচালক ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জরুরী খাদ্য সেবা (রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিশন এর তালিকার আওতায়) প্রদানে আইডিএফকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এর প্রেক্ষিতে আইডিএফ এর পক্ষ থেকে ৬,৭৮,২৩৭/- (ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ) টাকার খাদ্য সামগ্রী শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন ও বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর সহায়তায় গত ৩১ মে ২০২১ তারিখে ভাসানচরে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধির নিকট ত্রাণ হস্তান্তর করেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের চার সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। মোট ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) পরিবার, অর্থাৎ, ৩০০০ জনের জন্য এই ত্রাণ সামগ্রীর মাঝে ছিল পেঁয়াজ, আদা, রসুন, হলুদ গুড়া, মরিচ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিরা গুড়া। প্রতি পরিবারের জন্য পেঁয়াজ ৩ কেজি, রসুন ৫০০ গ্রাম, আদা ৩০০ গ্রাম, হলুদ গুড়া ২৫০ গ্রাম, মরিচ গুড়া ২৫০ গ্রাম, ধনিয়া গুড়া ২৫০ গ্রাম ও জিরা গুড়া ২০০ গ্রাম করে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

হালদা নদী সংবাদ

হালদা নদী এ উপমহাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। এক সময় বড় বড় রুই, কাতলা মাছের প্রচুর ডিম পাওয়া যেত এই নদীতে। নানা কারণে এই ডিমের পরিমাণ এখন অনেক কমে যাচ্ছে। কারণগুলির মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ উপদ্রবসমূহ কমিয়ে পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আইডিএফ পিকেএসএফ এর সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তারই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত বছরে সাম্প্রতিককালের রেকর্ড পরিমাণ ডিম সংগ্রহীত হয়। এ বছর আবার প্রাকৃতিক বৈরীতায় ডিমের পরিমাণ কমে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণায় একটি বিস্তারিত ও তথ্যবহুল নিবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন আইডিএফ এর মোঃ শামীম উদ দোহা। নিবন্ধটি আকারে একটু বড় হলেও এর গুরুত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণের কারণে আমরা এটি এখানে প্রকাশ করলাম।

হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা

ভূমিকা:

প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি 'হালদা নদী' এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। বাংলাদেশের পূর্ব-পাহাড়ি অঞ্চলের খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলার একটি নদী হালদা। 'হালদা নদী'- বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী এবং এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, যেখান থেকে সরাসরি রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, নদী থেকে পোনা আহরণের নজির থাকলেও হালদা ছাড়া বিশ্বের আর কোনো নদীতে ডিম আহরণের নজির নেই। এ কারণে হালদা নদী বাংলাদেশের জন্য এক বৈশ্বিক হেরিটেজও বটে। সম্পদ, অর্থনৈতিক অবদানসহ বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য হালদা নদী আমাদের দেশের জাতীয় মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্যের দাবিদার। এ বছর হালদা নদীর জন্য একটি বড় অর্জন হল এটিকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে ঘোষনা করা। হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারির পর এই নদীর মৎস্য, জীববৈচিত্র্য, নদীর স্বাভাবিক গতিধারা সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে আইডিএফ-পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় হালদা নদীর প্রজনন এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানো এবং হালদা পাড়ের ডিম সংগ্রহকারীদের সুবিধার্থে রাউজানের পশ্চিম বিনাজুরি এলাকার নদীর পাড়ে ৪ একর জমির উপর আইডিএফ হ্যাচারি নির্মাণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা :

দেশের অর্থনৈতিক নদী, কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে খ্যাত হালদা নদীকে ২০২০ সালের ২২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে সরকার। মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। হেরিটেজ ঘোষণা করায় হালদা নদী বিশ্বে পরিচিতির পাশাপাশি ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেব স্বীকৃতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালদা নদী এবং নদী তীরবর্তী ৯৩ হাজার ৬১২টি দাগের ২৩ হাজার ৪২২ একর জমিকে বঙ্গবন্ধু হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সরকারের গেজেট অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ এলাকায় ১২টি শর্ত কার্যকর হবে।

শর্তগুলো হচ্ছে:

১. এ নদী থেকে কোনও প্রকার মাছ ও জলজ প্রাণী ধরা বা শিকার করা যাবে না। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়নে প্রতিবছর প্রজনন মৌসুমে নির্দিষ্ট সময়ে মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা যাবে।
২. প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী কোনও প্রকার কার্যকলাপ করা যাবে না।
৩. ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে, এমন সব কাজ করা যাবে না।
৪. মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর কোনও প্রকার কার্যাবলী করা যাবেনা।
৫. নদীর চারপাশের বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবে না।
৬. কোনও অবস্থাতেই নদীর বাঁক কেটে সোজা করা যাবেনা।
৭. হালদা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ১৭টি খালে প্রজনন মৌসুমে (ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই) মৎস্য আহরণ করা যাবে না।
৮. হালদা নদী এবং এর সংযোগ খালের ওপর নতুন করে কোনও রাবার ড্যাম এবং কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ করা যাবে না।
৯. বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটির অনুমতি ব্যাতিরেকে হালদা নদীতে নতুন পানি শোধনাগার, সেচ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা যাবে না।
১০. পানি ও মৎস্যসহ জলজ প্রাণীর গবেষণার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটির অনুমতিক্রমে হালদা নদী ব্যবহার করা যাবে।
১১. মাছের প্রাক প্রজনন পরিভ্রমণ সচল রাখার স্বার্থে হালদা নদী এবং সংযোগ খালের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
১২. রুই জাতীয় মাছের প্রাক প্রজনন এবং প্রজনন মৌসুমে (মার্চ- জুলাই) ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলাচল করতে পারবে না।

হালদা নদী রক্ষায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনঃ

সরকারের উদ্যোগে চট্টগ্রামের হালদা নদীর সুরক্ষায় ৬ কিলোমিটার এবং পিকেএসএফ-আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে আরও ৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে হালদার মূল প্রজনন এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। অবৈধ জাল পেতে মা মাছ ধরা, ইঞ্জিন চালিত নৌকার চলাচল বন্ধ, বালু উত্তোলন বা ডলফিন রক্ষায় নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য এসব সিসি ক্যামেরা ব্যবহৃত হবে। আইডিএফ প্রতিনিধি ও নদীটির নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা পুলিশের একটি ইউনিট এই ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে নজরদারি চালাবে।

আইডিএফ-পিকেএসএফ পরিচালিত হালদা প্রকল্প এর আওতায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী হালদা নদীর মা মাছ পাহারা বা সুরক্ষায় কাজ করছে। কিন্তু এত বড় একটি নদীকে এত কম মানুষ দিয়ে পাহারা দেয়া সম্ভব না। এর প্রেক্ষিতে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন এর উদ্যোগ নেয়া হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (পিটিজেড, ৩৬০ ডিগ্রি, ২ কিলোমিটার জুম) ৮টি ক্যামেরার মাধ্যমে মদুনাঘাট থেকে কাগতিয়া সুইস গেইট পর্যন্ত মনিটরিং করা হচ্ছে। এর মধ্যে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর উদ্যোগে ৪টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। এই ক্যামেরাগুলো বসানোর ফলে যেকোনো স্থান থেকে নদী নজরদারি করা যাবে, রাতেও নদীতে কেউ জাল বসাচ্ছে কিনা, বালি উত্তোলন বা ডলফিন হত্যা করছে কিনা, অবৈধ কিছু করা হচ্ছে কিনা, সেটা বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে যারা অবৈধ মাছ ধরে বা বালু তোলে, তাদের মধ্যেও একটা ভীতির তৈরি হবে। ইন্টারনেট সংযুক্ত থাকায় যেকোনো স্থান থেকে এসব সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা যাবে।

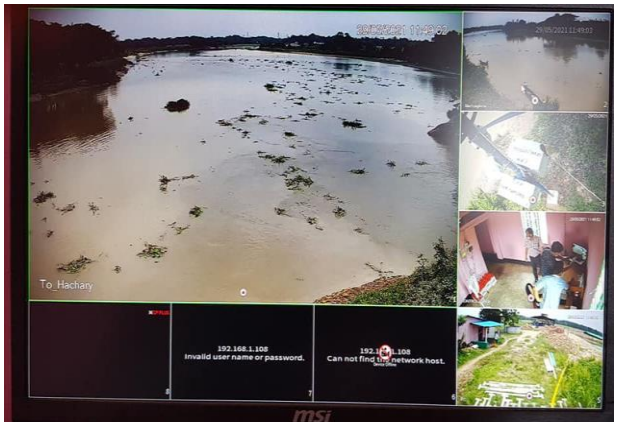

আইডিএফ হালদা হ্যাচারীঃ

হালদাতে চলতি বছর হতে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর উদ্যোগে চালু হয়েছে নতুন একটি আধুনিক হ্যাচারি যা রাউজানের পশ্চিম বিনাজুরি এলাকার নদীর পাড়ে ৪ একর জমির উপর নির্মিত। নতুন এ হ্যাচারিতে ১০টি পাকা আয়তাকার ট্যাংক, ৮টি মাটির কুয়া এবং ৫টি পাকা বৃত্তাকার ট্যাংক এবং সুবিশাল পুকুর রয়েছে। চলতি বছর এই হ্যাচারিতে প্রথম দফায় ৩৮০ কেজি এবং ২য় দফায় ২২০ কেজি কার্প মা মাছ এর ডিম দেয়া হয়। রেণু ফোটানো ছাড়াও এই হ্যাচারিতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সহ বহুমুখী কার্যক্রম চালু থাকবে। উল্লেখ্য মাছের ডিম সংগ্রহকারীরা যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে ডিম থেকে পোনা উৎপাদন করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে হাটহাজারী ও রাউজানে হালদার উভয় পাড়ে মৎস্য বিভাগ সর্বমোট ৬টি হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করেছিল। হাটহাজারী অংশের তিনটি হ্যাচারি ভাল অবস্থায় থাকলেও রাউজানের তিনটির মধ্যে দুটিই অকেজো হয়ে আছে। নির্মাণগত ত্রুটি, মিঠা পানি সরবরাহ অব্যবস্থাপনা, কুয়ার কাজের সংস্কার, তদারকি ও রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে হ্যাচারি গুলো থেকে প্রকৃত সুফল পাচ্ছে না ডিম সংগ্রহকারীরা। বেশিরভাগ হ্যাচারিতে নিজস্ব পুকুর ও গভীর নলকূপ না থাকায় বাধ্য হয়ে ডিম ফোটানোর সময় লবণ পানি ব্যবহার করতে হয় যা রেণু মারা যাবার অন্যতম প্রধান কারণ। এ অবস্থায় আইডিএফ নির্মিত আধুনিক হ্যাচারিটি ডিম সংগ্রহকারীদের দূর্ভোগের ভোগান্তি কমানোর পাশাপাশি রেণু উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রাকৃতিক বৈরিতায় প্রথম দফায় মেলেনি কাঙ্ক্ষিত ডিমঃ

এবছর হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা এবং হালদা নদী রক্ষায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী থেকে শুরু করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হালদার মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রকে নিয়ে অন্যরকম প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। সারা বছর অবৈধ মাছ শিকারী এবং নদী দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সহ মা-মাছ সুরক্ষায় তৎপরতা ছিল আগাগোড়া দৃশ্যমান। কিন্তু প্রাকৃতিক বৈরিতায় এবছর হালদায় প্রত্যাশিত ডিম পাওয়া যায়নি।

গত ২৫ মে মঙ্গলবার দিবাগত রাত একটার দিকে হালদায় মা মাছ প্রথম বার নমুনা ডিম ছাড়ে। ২৬ মে বুধবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ব্রুড মাছ দ্বিতীয় দফায় নমুনা ডিম দেয়। পরবর্তীতে ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার ভোর রাত থেকে তৃতীয় দফায় মা মাছ ডিম ছাড়ে। হালদা নদীর রাউজান অংশের অংকুরী ঘোনা, দক্ষিণ গহিরা, মোবারক খীল, পশ্চিম বিনাজুরী, কাগদিয়া, কাশেম নগর, আজিমের ঘাট, মগদাই, হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা, আমতোয়া, নয়া হাট, রামদাশ মুন্সিরহাট, মাদার্শা, দক্ষিণ মাদার্শা এলাকায় শত শত ডিম সংগ্রহকারী নৌকা নিয়ে ডিম সংগ্রহের জন্য অবস্থান করে। এবছর ডিম ধরার নৌকার সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি, যার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ টির মতো ছিল। নদী থেকে সরাসরি ডিম সংগ্রহের লোকের সংখ্যাও গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এবছর প্রায় ৮০০ জন ডিম সংগ্রহকারী নদী থেকে সরাসরি ডিম সংগ্রহে অংশ

নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির তথ্য অনুযায়ী প্রথম দফায় এবারের সংগৃহীত ডিমের মোট পরিমাণ প্রায় ৬৫০০ কেজি। অথচ বিগত বছর আহরিত হয় প্রায় ২৫ হাজার ৫৩৬ কেজি, যা বিগত ১৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে।

প্রথম দফায় প্রত্যাশিত ডিম না পাওয়ার কারণঃ

এবার হালদায় মা-মাছের ডিম সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় প্রত্যাশিত ফলাফল না আসার প্রসঙ্গে হালদা বিশেষজ্ঞ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ও হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির সমন্বয়কারী ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া প্রধান দু'টি কারণ দেখছেন। ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়ার মতে পরিবেশগত দু'টি প্যারামিটার সব হিসাব নিকাশ ওলটপালট করে দেয়। এগুলো হলঃ-

এক. এপ্রিল থেকে জুন মাস হালদার রুই জাতীয় মাছের প্রজনন সময়। এই তিন মাসের মধ্যে প্রতি মাসের অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা তিথিতে ভারী বৃষ্টিপাত হলে মা মাছ নদীতে ডিম ছাড়ে। কিন্তু এ বছর এপ্রিল-মে দুই মাস অতিবাহিত হলেও হালদা নদীর উজান অঞ্চলে প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত হয়নি। এর ফলে পাহাড়ি ঢল না আসায় নদীতে মাছের ডিম ছাড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি।

দুই. মে মাসের চতুর্থ 'জো' অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথি ছিল ২৩ থেকে ২৯ তারিখ। এ সময়ে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হলে মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের কারণে সাগর উত্তাল হয়ে ওঠে। পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে হালদা নদী জোয়ার-ভাটার নদী হওয়ার কারণে জোয়ারের সময় পানির উচ্চতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই জোয়ারের পানির সাথে হালদা নদীর পানিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

পরিবেশগত এই দু'টি বাধা-বিপত্তির কারণে হালদা নদীতে মাছের প্রজননের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়। কিন্তু মা-মাছেরা ডিম ছেড়ে দেয়ার উপযোগী পরিপক্বতা হয়ে উঠার কারণে যৎসামান্য অনুকূল পরিবেশে কিছু ডিম ছাড়তে একপ্রকার 'বাধ্য' হয়। কিন্তু পুরোপুরি ও প্রত্যাশিত স্বাভাবিক পরিবেশ-প্রকৃতি বিরাজমান না থাকায় হালদা নদীতে প্রচুর মাছের অবস্থান এবং দূষণমুক্ত থাকা সত্ত্বেও রুই জাতীয় মা-মাছেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাশিত পরিমাণে ও হারে ডিম ছাড়েনি।

আশার আলো দেখিয়ে ২য় দফায় পুনরায় ডিম ছাড়ে মা মাছঃ

প্রথম দফায় ডিম ছাড়ার পাঁচদিন পর ২ জুন বিকেল ৫ টার দিকে ফের ডিম ছাড়ে কার্প জাতীয় প্রজনন সক্ষম মাছ। ২য় দফায় সংগ্রহকৃত ডিমের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশি ছিল। প্রথমবার যখন মা মাছ ডিম ছাড়ে তখন হালদার পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল ৭২ শতাংশ। ২য় দফায় এটি নেমে আসে ০.৪৬ শতাংশ অর্থাৎ এক শতাংশেরও কম। পাশাপাশি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল নেমে আসায় অনুকূল পরিবেশ পেয়ে মা মাছ পুনরায় ডিম ছাড়ে। এদিন হালদা নদীতে হাটহাজারীর গড়দুয়ারা পয়েন্ট থেকে মা মাছ ডিম ছাড়তে শুরু করে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে হালদা নদীতে আজিমের ঘাট, অঙ্কুরিঘোনা, আমতুয়া, সত্তার ঘাট, রামদাশ মুন্সীর হাট, মদুনাঘাট, নাপিতের ঘোনা ও মার্দাশা এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে মা মাছ ডিম ছাড়ে। এ সময় স্থানীয় সংগ্রহকারীরা ডিম সংগ্রহ শুরু করেন। প্রায় ৩৫০টি নৌকায় হাজারখানেক মানুষ হালদা নদী থেকে ডিম সংগ্রহ করে এবং ৫০-২০০ গ্রাম পর্যন্ত ডিম আহরণ করে প্রত্যেক সংগ্রহকারী। ২য় দফায় সংগৃহীত ডিমের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কেজি।

বিগত ১০ বছর এ হালদা নদীতে ডিম সংগ্রহের পরিসংখ্যানঃ

হালদা নদীতে এ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে দুই দফায়, প্রথম বার (২৫-২৭) মে এবং ২য় দফায় ২রা জুন সর্বমোট ৮৫০০ কেজি ডিম সংগৃহীত হয়। গত বছর ২৩ মে আহরিত হয় ২৫ হাজার ৫৩৬ কেজি ডিম যা বিগত ১৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে । ২০১৯ সালে হালদা নদীতে ৭ হাজার কেজি ডিম পাওয়া যায়। ২০১৮ সালে ২২ হাজার ৬৮০ কেজি, ২০১৭ সালে এক হাজার ৬৮০ কেজি, ২০১৬ সালে ৭৩৫ কেজি, ২০১৫ সালে ২ হাজার ৮শ' কেজি, ২০১৪ সালে ১৬ হাজার ৫০০ কেজি, ২০১৩ সালে ৪ হাজার ২শত কেজি এবং ২০১২ সালে ১ হাজার ৬শ' কেজি ডিম সংগ্রহ করা হয়।

বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ-আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগ এর মাধ্যমে " হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন " শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ১০ বছরের হালদা নদী থেকে ডিম সংগ্রহের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী বছর গুলোতে ডিম সংগ্রহের পরিমাণ অনেকাংশে বেড়েছে। মূলত এই প্রকল্পের আওতায় হালদাকে নিয়ে বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণের সুফল ভোগ করছে হালদা পাড়ের ডিম সংগ্রহকারীরা।

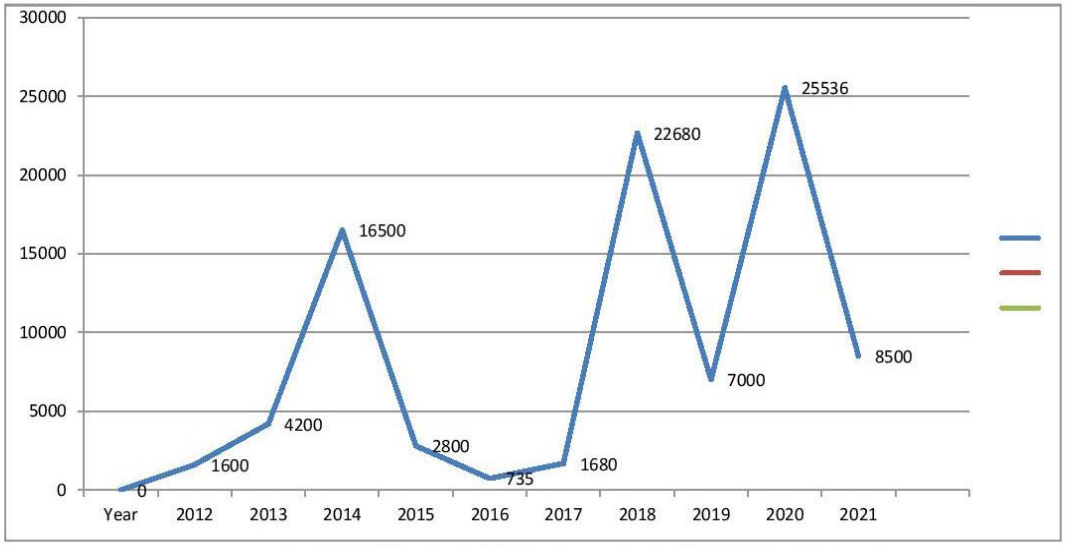

হালদা নদী থেকে বিগত ১০ বছরের ডিম সংগ্রহের গ্রাফ

বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতির পথে হালদা:

বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণার জন্য ইউনেস্কোর শর্ত অনুযায়ী হালদা নদী বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেরও যোগ্যতা রাখে। ইউনেস্কোর নির্ধারিত চারটি শর্তের (৭-১০নং) মধ্যে যে কোন একটি শর্ত পুরণ করলে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।

শর্ত চারটি হলো:

৭. চূড়ান্ত প্রাকৃতিক ঘটনা বা ব্যতিক্রমী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নান্দনিক গুরুত্ব সম্পন্ন হতে হবে;
৮. জীবন সৃষ্টির রেকর্ডসহ পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান পর্যায়গুলোর প্রতিনিধিত্বকারী অসামান্য উদাহরণ, ভূ-পৃষ্ঠ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি, বা উল্লেখযোগ্য ভূ-তাত্ত্বিক বা ভূ-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে;
৯. স্থলজ, মিঠা পানি, উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণিজ সম্প্রদায়ের বিকাশ এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ চলমান পরিবেশ ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির প্রতিনিধিত্বকারী অনন্য নিদর্শন হবে;
১০. বৈজ্ঞানিক বা সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে অসামান্য সার্বজনীন মানের বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত জীব বৈচিত্র্যের ইন-সিটু সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক আবাসস্থল হবে;

উপরোক্ত চারটি শর্তের মধ্যে হালদা নদী ৯ এবং ১০ নং শর্ত সম্পূর্ণ এবং ৭নং শর্ত আংশিক পূরণ করে। তবে শর্ত থাকে যে সংশ্লিষ্ট দেশ ইউনেস্কোর শর্ত পুরণকারী প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে প্রথমে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। যেহেতু জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে এর মধ্যে হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু ফিশারীজ হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেহেতু বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের পথে হালদা নদী আরও একধাপ এগিয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায় হালদা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। এ নদীকে কেন্দ্র করে সারা বছরে আবর্তিত হয় এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ। হালদা নদী থেকে প্রাপ্ত ডিম, উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ এবং এখান থেকে উৎপাদিত মাছের হিসাব করলে দেখা যায়, হালদা নদীর প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অবদান কমপক্ষে ৮শ' কোটি টাকার। এর সাথে কৃষিজ উৎপাদন, যোগাযোগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে যোগ করলে একক নদী হিসাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে হালদা নদীর অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতিকথা

১৯৯৩ সালে আইডিএফ এ যাত্রা শুরুর পর পরই নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিষয়ে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির কথা চিন্তা করেন এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। সাধারণ পর্ষদের তৎকালীন সদস্য ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে বান্দরবান এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর যাত্রা শুরু করেন। পাহাড়ি সে এলাকার মানুষ তখন ডাক্তার বা সাধারণ ঔষধ এবং পুষ্টি বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তখনকার সেই স্মৃতিকথা সম্পর্কে আমাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন আমাদের পুরোনো সহকর্মী আবদুল আজিজ।

বিষয় :- আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির সূচনালগ্নে

আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান আইডিএফ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৯৯২ সাল থেকে অবহেলিত পার্বত্য জনপদ বান্দরবান জেলার সুয়ালক ইউনিয়ন হতে। আমাদের ভিশন দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠন এবং মিশন "দুর্গম পাহাড়ী জনপদ ও বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ"। সে লক্ষ্যে প্রথমতঃ আমাদের কাজ ছিল পুঁজিহীনদের মাঝে পুঁজির সরবরাহ করা। গ্রামীণ মডেলে দল ও কেন্দ্রগঠন। সে লক্ষ্যে সুয়ালক ও পরবর্তীতে বালাঘাটা শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। অত্র এলাকায় ঋণ দেয়া ছিল অতীব কঠিন কাজ। তারা ঋণকে ভয় পেত। মোটিভেশনের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে যখন তারা আয়বর্ধনমূলক কাজ শুরু করেন তখন তারা ভয়কে জয় করা শুরু করেন। ঋণকে হাতিয়ার করে আমরা দারিদ্র্যমুক্তির যুদ্ধ শুরু করলাম। আমাদের এ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব জহিরুল আলম। আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক।

এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে এলাকার ঘরে ঘরে গিয়েছেন। সম্মানিত সদস্যাদের জীবনযাত্রা কাছে থেকে উপলব্ধি করেছেন। এসময় তিনি দেখেন ঋণ নিয়ে করা অর্থ কোন কোন খাতে খরচ হচ্ছে। তিনি দেখেন পরিবারের সদস্য কেউ অসুস্থ্য হয়ে গেলে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা খাতেও খরচ হয়ে যায় টাকাকড়ি। তাদের এ দুর্ভোগ লাঘবের প্রত্যয়ে তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাজ হাতে নেন। আমার সুযোগ হয়েছে ১৯৯৫ সাল থেকে তার সাথে কাজ করার। তখন আমরা শাখা পর্যায়ে মাত্র ৫/৭ জন মানুষ। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আমাদেরকে জানান স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিতে হবে। সে লক্ষ্যে বালাঘাটা শাখার ১ম কেন্দ্র পাইক্ষ্যং নয়াপাড়া এবং ১১শ কেন্দ্র তম্প্রুপাড়ায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা সকল সহকর্মীগণ মিলে অত্র এলাকায় প্রচার প্রচারণা শুরু করি। যাতে সকল সদস্যাগণ উপস্থিত থাকার পাশাপাশি পরিবারের সকলকে রাখা যায়। তার কারণ হল পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। আমরা আলোচনার মাধ্যমে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের বুধবার দিনক্ষণ ঠিক করি। ঐ দিন বান্দরবান বাজার বিধায় সকলে বাজার শেষে ১০/১১টায় বাড়িতে চলে আসেন।

পরবর্তী গন্তব্য তম্প্রুপাড়া। দূরত্ব প্রায় ১ কিলোমিটার পাহাড়ী উচুনীচু রাস্তা। এ পথ সকলকে হেটে যেতে হয়। সবাই হাঁটার আনন্দ উপভোগ করেছে। আমরা যাওয়ার সাথে সাথে কিয়াং ঘরের ঘন্টা ধ্বনি বাজানো হল, যা আমাদের আগমণী বার্তা। সকলের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি শুরু করলাম। সকলে আমাদের কথাবার্তা শুনলেন, ঔষধ নিলেন, প্রেসার মাপলেন। তারা সকলে বললেন যে এতবড় ডাক্তার তাদের পাড়ায় কখনও আসে নি। সকলে উৎফুল্ল। আমরা দুপুর ১টা নাগাদ প্রেগ্রাম শেষ করে বান্দরবান চলে আসি।

আমাদের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে অবগত করলাম। তিনি আমাকে চট্টগ্রাম শহরের প্রবর্তক মোড় এলাকায় সেন্ট্রাল ক্লিনিকে গিয়ে ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী স্যার এর সাথে দেখা করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর তারিখ নির্ধারণ করে তাকে জানাতে বলেন যাতে সকলে একসাথে চট্টগ্রাম থেকে নির্দিষ্ট দিনে একসাথে যেতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল

চৌধুরী আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন সময় থেকে পরিচিত। তা আমি নির্বাহী পরিচালক স্যারকে জানালাম। তিনি এতে খুশী হন। আমি ২/১ দিন পর চট্টগ্রাম এসে উনার চেম্বারে দেখা করে সর্ববিষয়ে অবগত করি। তিনি আমাকে জানান প্রোগ্রামের ব্যাপারে তোমার স্যারের সাথে কথা হয়েছে, তোমরা তারিখ নির্ধারণ করে জানালে সবাই মিলে একসাথে গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবো। তিনি কিছু ঔষধপত্রের নাম লিখে দিলেন যা প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে লাগে। সেখানে বসেই স্যারের সাথে ফোনে কথা বলে প্রোগ্রাম চুড়ান্ত করলাম। সবাই চট্টগ্রাম থেকে একসাথে গিয়ে আমার বন্ধুবর হারুন সওদাগরের বান্দরবান বাসায় সকালের নাস্তা করবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে আমি এবং হারুন একই বাসায় থাকি, যা আমাদের আইডিএফ এর ঐসময়ের সকলের জন্য অনন্য একটি ঠিকানা। প্রোগ্রামে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও ডাঃ মামার পরিবারসহ যাবেন বলে আমাকে জানালে ঐ ব্যবস্থা করি। যাতে প্রোগ্রামের আগে সকলে ফ্রেশ হয়ে যেতে পারেন।

আমাদের নির্দিষ্ট তারিখ ছিল ১৯৯৬ সালের মে মাসের খুব সম্ভবত ১৫ তারিখ (স্মৃতি থেকে লেখা)। ঐ দিন আমি আমার সহকর্মীদের ২ টি স্থানের দায়িত্ব পূর্বের দিন বুঝিয়ে দিয়ে আসি। তখন বালাঘাটা শাখায় কর্মী ছিল প্রসিমং মার্মা (বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক ধোপাছড়ি শাখা) ও পলাশ মার্মা (প্রয়াত)। মি. মংচিং মং মার্মা (বর্তমান ব্যবসায়ী, বান্দরবান সদর থোয়াইচপ্রু মাস্টার মার্কেট) আমাদের সুয়ালক শাখা থেকে গিয়ে প্রোগ্রামে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। স্যাররা ঐদিন সকাল ৯ টার মধ্যে বান্দরবান পৌঁছালেন। ফ্রেশ হয়ে আমরা দুইটি গাড়ি নিয়ে পাইক্ষ্যং নয়াপাড়ার কাছাকাছি গিয়ে নামলাম। সেখান থেকে পায়ে হেটে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে কর্মসূচি শুরু করি। আমরা পৌঁছানোর পূর্বেই সদস্যাগণ পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি বাঁশের মাচায় উপস্থিত হন। স্যারেরা গিয়ে সকলের সাথে পরিচিত হয়ে স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম শুরু করেন। আলোচনার বিষয় ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। খাবার গ্রহণের পূর্বে ও শৌচকার্যের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বেশি গরমে কাজ করতে গিয়ে বেশী বেশী পানি (লবণ দিয়ে) পান করা, পরিবারের সকলে মিলে কৃমির ঔষধ সেবন, খালি পায়ে টয়লেট ব্যবহার না করা ইত্যাদি। ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী আগতদের প্রেসার মাপলেন যা তারা ইতিপূর্বে কখনও করেনি। আমাদের এসকল কর্মকান্ডের মাঝে ঔষধও বিতরণ করা হচ্ছিল। পাড়ায় এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সকলে তা দেখে অভিভূত। পাইক্ষ্যং, নয়াপাড়ার কাজ আমরা ১১ টার মধ্যে শেষ করি।

সেখান থেকে পরবর্তী গন্তব্য তম্প্রুপাড়া। দূরত্ব প্রায় ১ কিলোমিটার পাহাড়ী উচুনীচু রাস্তা। এ পথ সকলকে হেটে যেতে হয়। সবাই হাঁটার আনন্দ উপভোগ করেছে। পাশে পড়লো আমবাগান। এলাকার লোকজন আমাদেরকে খাওয়ার জন্য আম দিলেন। ঐ পাড়ায় আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ বড় বাঁশের মাচা। পাইক্ষ্যং বুয়াপাড়ার চেয়ে এ পাড়ার পরিবারের সংখ্যা বেশি। আমরা পৌঁছানোর আগেই সকলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা যাওয়ার সাথে সাথে কিয়াং ঘরের ঘন্টা ধ্বনি বাজানো হল, যা আমাদের আগমণী বার্তা। সকলের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি শুরু করলাম। সকলে আমাদের কথাবার্তা শুনলেন, ঔষধ নিলেন, প্রেসার মাপলেন। এ মধ্যে লোকজন তাদের গাছ থেকে আম এনে আমাদের খাওয়ালেন। তারা সকলে বললেন যে এতবড় ডাক্তার তাদের পাড়ায় কখনও আসে নি। সকলে উৎফুল্ল। আমরা দুপুর ১টা নাগাদ প্রেগ্রাম শেষ করে বান্দরবান চলে আসি।

আজকে বসে ভাবলে অবাক লাগে আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চিন্তা কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল। বর্তমানে সংস্থার স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম অনেক বড় হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা চালু হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে। প্রতিটি এলাকায় ডাক্তারসহ স্বাস্থ্যকর্মী আছে। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সদস্যাগণসহ সকলে ভালো থাকছেন। এ কর্মসূচি আমাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। পরিশেষে শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এ লেখা শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন এবং ডাক্তার মামাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

লেখক : যোনাল ম্যানেজার
ঢাকা যোন, আইডিএফ।

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আইডিএফ এর দুইজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব জাফর উল্লাহ ২০২০ সালের ২০ শে জুলাই এবং ডাঃ ইসমাইল চৌধুরী একই বছর ২৭ শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না আলাইহে রাজিউন)। আইডিএফ গঠন এবং একে গড়ে তোলার পেছনে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রমকে আমরা গভীরভাবে স্মরণ করি। আইডিএফ পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই। নিচে তাঁদের দু'জনের কর্ম এবং জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ পরিষদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জাফর উল্লাহ বিগত ১৫ জুলাই, ২০২০ ইং তারিখ অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। জনাব জাফর উল্লাহ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ সালে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আবদুল করিম এবং মাতার নাম মরহুম তায়েব্যা খাতুন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। সাফল্যের সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্ল্যানিং ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ শিল্প মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট চীফ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং আট মাস যাবত কারারুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে অসম্ভব নির্যাতনের শিকার হন। পরবর্তীতে তিনি মুক্ত হলেও এই নির্যাতনের বিরূপ প্রভাব সারাজীবন শারীরিকভাবে ভোগ করেন।

তিনি পেশাগত কাজের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, দুঃস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকুরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাধারণ পরিষদ সদস্য এবং বিভিন্ন মেয়াদে নির্বাহী পরিষদ সদস্য হিসেবে দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। আইডিএফকে গড়ে তোলার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ২ সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মিসেস রওশন আরা চৌধুরী মিরপুর গার্লস আইডিএল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট এ গণিত এর শিক্ষক ছিলেন। জনাব জাফর উল্লাহ অত্যন্ত সফল মানুষ এবং সমাজসেবক হিসেবে প্রশংসিত ছিলেন।

জনাব জাফর উল্লাহর মৃত্যুতে আইডিএফ পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করছে। সংস্থার প্রতি তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণের পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে আইডিএফ এর সাথে সম্পৃক্ততা আমাদের সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও গভর্নিং বডির সম্মানীত জয়েন্ট সেক্রেটারী ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী বিগত ২৭ আগস্ট, ২০২০ ইং তারিখে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ও অন্যান্য অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী ৩০ জুন, ১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলার বড়হাতিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলবী নাজির আহমেদ এবং মাতার নাম মরহুম সফুরা খাতুন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। সাফল্যের সাথে সরকারী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন মেডিসিন ও ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার ৪৪ বছরের চাকুরি জীবনে তিনি বিভিন্ন সংস্থায় যেমন চট্টগ্রাম স্টিল মিল হাসপাতাল, বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক কেন্দ্রে সিনিয়র মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন। ডাক্তারী পেশার মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী অত্যন্ত সফল ডাক্তার এবং সমাজসেবক হিসেবে প্রশংসিত ছিলেন।

১৯৯২ সালে ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী তাঁর বন্ধু জনাব জহিরুল আলম এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আইডিএফ এ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সবসময়ই মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেয়েছিলেন। আইডিএফ এ যোগদান তাঁর সেই পথকে আরো মসৃণ করেছিল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সংস্থার সহ-সভাপতি হিসেবে ৩ মেয়াদে গভর্নিং বডির দায়িত্ব পালন করেন এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে ১ মেয়াদ পূর্ণ করেন এবং অন্য মেয়াদ চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আইডিএফ এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে আইডিএফএর স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি তিন সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মিসেস রেহানা ইসমাইল ইংরেজী মাধ্যমের একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

ডাঃ মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর মৃত্যুতে আইডিএফ পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করছে। সংস্থার প্রতি তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে আইডিএফ এর সাথে সম্পৃক্ততা আমাদের সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিদেশে শিক্ষা সফর

আইডিএফ এবং নেপালের শীর্ষস্থানীয় দু'টি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা যেমন RMDC ও CSS এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে দুই দেশের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রতিনিধিদের 'বিনিময় সফর' হচ্ছে গত ক'য়েক বছর যাবত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের একটি দল জানুয়ারি ২০২০ সময়ে এক সপ্তাহের জন্য নেপালের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দলটির নেতৃত্ব দেন আইডিএফ এর মাকসুদুর রহমান। ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে তারই অভিজ্ঞতা লিখে পাঠিয়েছেন আইডিএফ পরিক্রমায়।

ভূস্বর্গ ভ্রমণে

চাকরির সুবাধে দেশের বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশ ভ্রমণের সুবর্ণ সুযোগ। সেটা আবার 'হিমালয় কন্যা' খ্যাত অনিন্দ্যসুন্দর নগরী নেপাল সফর। নেপাল দেশটার কথা মনে পরলেই চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে উঠে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টসহ বিভিন্ন পর্বতমালার অপরূপ সৌন্দর্য, নাগরকোট, পোখারার ফেওয়া লেক, আর কারুকার্যময় মন্দির। গত ১৮-২৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দুটি সংস্থা আইডিএফ (ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন) এবং সিদীপের মোট ১২ জন সদস্যের একটি টিম নেপাল ট্যুর করি। ট্যুরটি ছিল নেপালী এনজিও Centre for Self-help Development (CSD)-এর আমন্ত্রণে। ফলে উক্ত ৮ দিনের সফরে তারাই সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রথম দিন (১৮/০১/২০২০) হোটেলে উঠে বাহিরের অন্য এক হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে আসি। দ্বিতীয় দিন (১৯/০১/২০২০) আমরা Mahila Sahakari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha সমিতি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ, ব্রাঞ্চ অফিস ও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করা এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করি। বিকালে CSD-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে যাই। সেখানে আমাদের ফুল দিয়ে ও উত্তোরীয় পড়িয়ে আমন্ত্রণ জানান CSD-এর Executive Chief Mr. Bechan Giri। সেখানে ১ ঘণ্টার মতবিনিময় সভায় Mr. Bechan Giri তার প্রতিষ্ঠান CSD-এর কর্মকাণ্ডের উপর তথ্যবহুল একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেন। আমাদের ট্যুরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, নেপালের মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা। পাশাপাশি নেপালের পাহাড়-নদী-ঝর্ণা ইত্যাদির সৌন্দর্য উপভোগ করা।

অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে কাঠমান্ডু ও পোখারা শহরের National Microfinance in Mahadev Besi, Dhading; Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Kakani; Mahila Sahakari Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha ইত্যাদি এনজিও'র সমিতি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ, ব্রাঞ্চ অফিস ও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করা এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করি। এছাড়া পোখারার Hemja-এ Muktinath Bikas Bank-এর ব্রাঞ্চ অফিস পরিদর্শন করি। সদস্যরা যে সকল প্রকল্পে টাকা লগ্নি করে তার মধ্যে অন্যতম গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, ধান চাষ, স্টবেরী চাষ ইত্যাদি। সেখানকার সমিতির সদস্যগণ খুবই সুশৃঙ্খল এবং সংস্থার নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সমিতিতে সদস্যগণ একই ধরনের পোষাক পরিধান করেন এবং সভার শুরুতে ও শেষে শপথবাক্য পাঠ করেন।

ট্যুরের ৩য় দিন অর্থাৎ ২০/০১/২০২০ তারিখ আমরা কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাই এবং ৩ দিন সেখানে অবস্থান করে ৬ষ্ঠ দিন অর্থাৎ ২৪/০১/২০১৯ তারিখ পোখারা থেকে কাঠমান্ডু ফিরে আসি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পোখরা শহরকে 'নেপালের ভূস্বর্গ' বা 'নেপাল রানী' বলা হয়। নেপাল পর্যটন বিভাগের একটি শ্লোগান আছে, 'তোমার নেপাল দেখা পূর্ণ হবে না, যদি না তুমি পোখারা দেখ।' পোখারা থেকে বিশ্বের দীর্ঘতম (১৪০ কিলোমিটার) সারিবদ্ধ হিমালয় পাহাড়ের সারি দেখা যায়। পোখারাকে, 'মাউন্টেন ভিউ'-এর শহরও বলা হয়। এখান থেকে 'অন্নপূর্ণা' ও মাছের লেজের মতো দেখতে 'মচ্ছ পুছরে' পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়, যা বিশ্বখ্যাত চারটি পর্বতশৃঙ্গের একটি। এই পোখারাতেই আছে অনেক দর্শনীয় স্থান।

কাঠমান্ডু-পোখারা আসা যাওয়ার মুহূর্ত ছিল খুবই উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক। কাঠমান্ডু থেকে পোখারা দীর্ঘ ৮ ঘণ্টার যাত্রা। নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলা। পাহাড়ের গাঁ ঘেষে, কখনও দুই পাহারের মাঝে আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু, খাঁড়া-ঢালু রাস্তার এক আশ্চর্য সেতু বন্ধন। চারদিকে মনোরম ও রোমাঞ্চকর বিশাল বিশাল পাহাড়। চলতি পথে উঁচু পাহাড় থেকে নিচের দিকে তাকালে যে সৌন্দর্য দেখা যায় তা ছিল নয়নভোলানো। নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে নদীগুলো। পোখারা যাওয়ার পথে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নীরবে বয়ে গেছে ত্রিশুলি (Trishuli) নদী, যার সৌন্দর্য যে কোন মানুষকে বিমোহিত করবে। নদীগুলোতে কোন মাটি-কাঁদা নেই, ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে হালকা স্রোতে বয়ে গেছে এঁকে-বেঁকে। দেখে মনে হয় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বড় আকৃতির ঝর্ণাধারা। পোখারা শহর দিয়ে আরও বয়ে গেছে Marsyangdi ও Seti নদী। নদীর মাঝে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতুর পাশাপাশি রয়েছে ঝুলন্ত সেতু–যা পোখারার সৌন্দর্যকে অনেকগুণ বাড়িয়েছে।

যে সকল দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছে :

ভক্তপুর (Bhaktapur) : রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে নেপালের অন্যতম দর্শনীয় স্থান ভক্তপুর (Bhaktapur)। প্রাচীন এ শহরটি ছিল প্রাচীন রাজ-রাজাদের আবাসস্থল। শহরটির বুদগাঁও ও খৌপা নামে আরো দুইটি নাম

রয়েছে। শহরটি মধ্যযুগীয় শিল্প-সাহিত্য, কাঠের কারুকাজ, ধাতুর তৈরি ভাস্কর্য ও আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত। এখানে দেখা যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের অপূর্ব সমন্বয়। তবে ভক্তপুরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান হল দরবার স্কয়ার (Durbar Square)। এখানে প্রাচীন অনেকগুলো রাজপ্রাসাদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির। ভক্তপুরের উল্লেখযোগ্য আরো কিছু দর্শনীয় স্থান হল পটার্স স্কয়ার, ভৈরবনাথ মন্দির, ভৈরব মূর্তি, রাজা ভূপতিন্দ্র মাল্টার কলাম, ভত্সলা দুর্গা মন্দির, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির, ফাসিদেগা মন্দির, দত্তনারায়ণ মন্দির, ভীমসেন মন্দির ইত্যাদি। পুরো শহরটিই ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ফেওয়া লেক: এটি নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক লেক। পর্যটকদের আদর্শ বিনোদন কেন্দ্র এটি। লেকের অন্য পাড়টি পাহাড়-ঘেরা। পাহাড় বেয়ে চুইয়ে নামছে পানি। রঙ বেরঙের নৌকায় ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সাথে হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি আমরা। লেকটির দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১.৫ কিলোমিটার।

ডেভিস ফল: ফেওয়া লেকের পানি থেকেই উৎপন্ন ডেভিস ফল। এই লেকের পানিই ঝর্ণাধারার মত দ্রুতবেগে একটি গুহার মধ্যে পড়ে। গুহার মধ্যে পানি পড়ে বাষ্পের মত জলকণা ছড়িয়ে যেতে থাকে বা বাতাসে তা উড়তে থাকে। সে এক অসাধারণ অনুভূতি, মোহনীয় পরিবেশ। ডেভিস ফল-এ ঢুকতেই একপাশে হিমালয়ের প্রতিকৃতি তৈরি করা।

মহেন্দ্র গুহা: ডেভিস ফল-এর বিপরীতে চুনা পাথরের একটি গুহা যার নাম মহেন্দ্র গুহা। এই গুহাটি মৃত রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহাদেব-এর নামে নামকরণ করা হয়। এর ভিতরে ছোট ছোট স্বল্প পাওয়ারের বাল্ব লাগানো আছে। ভিতরে পায়ের নিচে বড় বড় পাথর, স্বল্প আলো, গা ছমছম পরিবেশ। গুহার ভিতরে হিন্দু ধর্মের প্রধান যুদ্ধ দেবতা মহাদেবের মূর্তি স্থাপন করা। সেখানে একজন পুরোহিতও আছেন।

শরনকোট (Shoronkot): পোখারার শরনকোট পর্যটকদের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে পর্বতমালার অপূর্ব দৃশ্য, পোখরা ভ্যালী ও ফেউয়া লেক দেখা যায়। শরনকোট পোখারা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৫৯২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। একদিকে নতুন সূর্য উদয়, আরেকদিকে সূর্যের প্রথমআলো অন্নপূর্ণা, মচ্ছ পুছরে পাহাড়ে পড়ে প্রথমে লাল বর্ণ এবং কিছুক্ষণ পর সাদা বর্ণ ধারণের দৃশ্য, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! যা দেখার জন্য আমরা সূর্য উঠার আগেই অন্ধকারের মাঝেই শীতকে মাড়িয়ে শরনকোটে পৌছাই।

ওয়ার্ল্ড পেস প্যাগোডা (World Peace Pagoda): এটি নেপালের দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা, অন্যটি বৌদ্ধের জন্মস্থান, লুম্বিনি এ। এখানে বুদ্ধের প্রতীকিসহ পবিত্র নিদর্শনসমূহ সজ্জিত করে রাখা আছে। এটি বিশ্ব শান্তির প্রতিকী হিসেবে ১৯৭৩ সালে তৈরি করা হয়। এটি ১১০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এখান থেকে আমরা অন্নপূর্ণা পাহাড়কে অনেকটা কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। এছাড়া এখান থেকে পোখারা শহর এবং ফেওয়া লেকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করেছি।

চন্দ্রগিরি (Chandra Gri): চন্দ্রগিরি শিব মন্দির নেপালের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর একটি। এটি কাঠমান্ডু শহরের পশ্চিমে পাহাড়ের চূঁড়ায় অবস্থিত। এটি ২৫৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। আমরা ক্যাবল কারে মন্দিরে উঠেছি। প্রতিদিন এখানে বিপুল সংখ্যক পর্যটক আসেন। এই জায়গাটি নেপালের ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অপূর্ব নির্দশন হিসেবে পরিচিত।

পশুপতি মন্দির : পশুপতি নেপালের বিখ্যাত ও প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটি। এটি কাঠমান্ডু শহরে অবস্থিত। মন্দিরে রয়েছে অনেক বানর। বানরগুলো মন্দির চত্বর ও তার আশেপাশে লাফালাফি করছে। এসব বানরকে নেপালীরা 'পবিত্র দূত' বলে মনে করেন এবং তাদের ধারণা বানরগুলো বুদ্ধের সময়কাল থেকেই রয়েছে। বানরের পাশাপাশি রয়েছে অনেক কবুতর। দেবদেবীর মুর্তি দ্বারা পুরো এলাকা বেষ্টিত। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক হিন্দু এখানে আসে এবং সর্বদা প্রার্থনা করে।

এছাড়াও ট্যুরের সপ্তম দিন সিএসডি'র (CSD)-এর Executive Chief Mr. Bechan Giri' র আমন্ত্রণে কাঠমান্ডুর বিখ্যাত Hotel Green হোটেলে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করি। সেখানে তিনি আমাদের সাথে পরিচিত হন এবং সকলের নিকট ট্যুরের অভিজ্ঞতা জানতে চান। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর আমাদেরকে বিভিন্ন খাবারের সাথে নেপালের ঐতিহ্যবাহী স্যুপ (৮ প্রকারের ডাল দিয়ে তৈরি) এবং মোমো পরিবেশন করা হয়। সবশেষে তিনি আমাদের সকলকে ট্যুর সার্টিফিকেট এবং উপহার প্রদান করেন।

নেপালের সৌন্দর্য, নান্দনিক শিল্পকর্মের পাশাপাশি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে তাদের আতিথিয়তা এবং শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানেই তারা বিভিন্ন ধরনের ফুল, উত্তোরীয় ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেন। নেপালে আমাদের খাবার তালিকায় ছিল বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, সবজি, সালাদ, শাক, ডাল, চাটনি, কাঁচামরিচ, ভাত ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল নান রুটি, বাটার রুটি, কলা, দই, বাটার, জেলি বিভিন্ন ফল, চা-কফি ইত্যাদি।

ট্যুরের প্রতিদিন সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে থেকে আরামদায়ক ও উপভোগ্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই CSD- Director জনাব সতিস মানশ্রেষ্ঠা কে। এছাড়া সোপান বিসতা, সঞ্জয় ও দিপেন্দ্র জোসী'র বন্ধুত্বও আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিদেশ সফরে আমাকে নির্বাচন করার জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল স্যার এবং শ্রদ্ধেয় নির্বাহী পরিচালক স্যারের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মাকসুদুর রহমান
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, আইডিএফ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২১

১. ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	বিতরণ (জুলাই ২০২০-জুন, ২০২১)		মোট জুন ২০২১ পর্যন্ত বিতরণ	
	টাকা (কোটি)	%	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	২.২	০.৫৬	১৫.৯০	০.৪৭
জাগরণ/RMC/UMC	১৪৩.৮৮	৩৬.৫৬	১৯৬২.৪৩	৫৭.৭৬
অগ্রসর/ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৬৫.৯৬	৪২.১৭	১০২১.০৩	৩০.০৫
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪২.১৪	১০.৭১	৩৩১.৯৮	৯.৭৭
অন্যান্য	৩৯.৩৭	১০.০০	৬৬.২০	১.৯৫
মোট	৩৯৩.৫৫	১০০	৩৩৯৭.৫৪	১০০

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জুলাই ২০২০-জুন, ২০২১)	সংখ্যা (মোট জুন ২০২১ পর্যন্ত)	বিবরণ	সংখ্যা
ভর্তি	২৮৪৬৫	৫৭৬৭৫০	সদস্য সংখ্যা জুন ২০২০ পর্যন্ত	১২১৪৫১
বাতিল	৩৫৪৪৮	৪৬২২৮২	মোট জুন ২০২১ পর্যন্ত	১১৪৪৬৮

২. সোলার কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১		মোট জুন, ২০২১ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	%	এ পর্যন্ত	%
সোলার হোম সিস্টেম	৩,৬৯৮	৬৯.৬	১,২৭,২৭৫	৯১.২১
স্ট্রীট লাইট	১,৪৬২	২৭.৫	৯৩২৪	৬.৬৮
মিনিগ্রীড	১৫৪	২.৯	২৯৩৯	২.১১
মোট	৫,৩১৪	১০০	১৩৯৫৩৮	১০০

৩. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১			মোট জুন, ২০২১ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	৪০২.০০	১৩,৬৯২,৭৬০.০০	৭৯.০১	১১,২১২	১০৪,৫৯০,০০০	৫৪.৮৫
চিকিৎসাসেবা	৭,৪৭০.০০	৩,২৩০,৬৪২.০০	১৮.৬৪	১২৬,৩৭৫	৮০,৫২০,০০০	৪২.২২
প্রকল্পঝুঁকি	৩৮.০০	৪০৬,৫৮৩.০০	২.৩৫	৬৯৮	৫,৫৯০,০০০	২.৯৩
মোট	৭,৯১০.০০	১৭,৩২৯,৯৮৫.০০	১০০	১৩৮,২৮৫	১৯০,৭০০,০০০	১০০.০০

৪. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১		মোট জুন, ২০২১ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১০৬৯	৫০৬৩	৪৪৭৮	৪৫,০৮৭
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১৫১৮৩	১৩৬৩৯৪	৭২৯৫১	৭,৩৪,৯৭১
কাউন্সেলিং সেশন	১৬১৭৩	১৯৬১১৯	৪৯৮১৯	৫,৫১,৮৭৬
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২৬৫৯ জন	৫,৯৪,৮১৬ টাকা	৪৫০৮৭ জন	১,১৭,০০,৯৬৩ টাকা
টেলিমেডিসিন	৪৩৬	৯৭৫৪	১০৯৬	২৪,২৬৮
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	-	-	৮৬ টি ক্যাম্প	২৮,৯৪৯
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	২৪ টি ক্যাম্প	১২,৩৫৪